ক্যালকাটা বুক ক্লাবের বই

মস্কো
বনাম
পণ্ডিচেরি

ক্যালকাটা বুক ক্লাবের বই
ক্যালকাটা বুক ক্লাবের বই
ক্যালকাটা বুক ক্লাবেব বই

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি

শিবরাম চক্রবর্তী

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন সংস্করণ ১৩৫৯

প্রকাশক

নির্মলকুমার সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

জিতেন্দ্রনাথ বসু

দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া

৩১ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট

মণীন্দ্র মিত্র

দাম এক টাকা আট আনা

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মস্কোবনাম পণ্ডিচেরি—বইটি অনেকদিন থেকে বাজারে মিলছিল না। অবশেষে ক্যালকাটা বুক ক্লাবের মহিমায় নতুনরূপে এই সুলভ সংস্করণ হয়ে বেরুলো। এর লেখাগুলি দু'যুগ আগেকার—লেখকের তখন প্রথমযৌবন—তারুণ্যের সহজাত যে-স্পর্ধা এর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে তার কোনো কৈফিয়ৎ দেবার দরকার করে না। তরুণরা এই স্পর্ধা যে কোথ্‌থেকে পায় সে-এক রহস্য! আরো বিস্ময়ের এই যে, সেই স্পর্ধায় উত্তরোত্তর কালের তরুণদের সহজ উত্তরাধিকার দেখা যায়, যে-স্পর্ধায় তৎকালীন তাবৎ প্রশ্নের নিজের মত করে উত্তর দেবার অধিকার তারা পেয়েছে বলে মনে করে। তারপর অনেক ভূয়োদর্শনের পরে—উত্তরকালে যখন নিরুত্তর থাকার দিন আসে তখন প্রথম বয়সের এই হঠকারিতাকে পরমাশ্চর্যের মতই মনে হয়।

রচনাগুলি প্রথম বই হয়ে বেরয়—'আজ এবং আগামী কাল'—এই নামে—১৯২৯ সালে। বলা বাহুল্য এসব লেখা তারো ঢের আগেকার। নবশক্তি ইত্যাদি কাগজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তাদের কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সাহিত্যিক ও সামাজিক—দু ভাগ করে একাধারে আনা হয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণের সময় অনেক লেখার খোঁজ মেলেনি বলে বাধ্য হয়েই সেগুলি বাদ দিতে হয়েছিল। পরের-সংস্করণের-প্রকাশক শ্রীমহাদেব সরকার অনেক কষ্ট করে পুরণো কাগজের কীটদষ্ট পাতা থেকে সেগুলির পঙ্কোদ্ধার করেন—তাঁরই চেষ্টা-যত্নে পরিবর্দ্ধিতরূপে 'মস্কোবনাম পণ্ডিচেরি' নামে বইটি বেরয়। তাঁর এ-ঋণ আমি কোনোদিন শুধ্‌তে পারবো বলে মনে হয় না। মার্জিত রুচির উচ্চমনা প্রকাশক আরো আছেন আমি জানি, বৈদগ্ধ ও কৃতবিদ্যতায় তাঁর চেয়ে হয়ত কম নন। কিন্তু মহাদেবের ব্যবহার, এক কথায়, দেবতুল্য। এই শুধু বলতে পারি, প্রকাশকের কাছ থেকে অতটা অন্তরঙ্গতা আর সৌহার্দ আমি খুব কমই পেয়েছি। এই হেতু শুধু সেই-ঋণের কথাই নয়, তাঁর নামটিও আমার বইয়ের সঙ্গে আমি যুক্ত রাখতে চাই। এইসূত্রে, তাঁর

সংকলিত সংস্করণের গোড়ায় যে-চমৎকার ভূমিকাটি তিনি লিখেছিলেন সেটি পুরোপুরিই এখানে উদ্ধৃত করলুম—

"বহু বিপত্তির মাঝে পাঠকসমাজের নিকট 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' উপস্থিত করা গেল। লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর অভিনব প্রবন্ধ-সংকলন 'আজ এবং আগামী কাল' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে, এবং অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে তৎকালে প্রগতিবাদী কর্মী ও ভাবুকসমাজ 'আজ এবং আগামী কাল'-এর রচনায় নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল; সুধী পাঠকবর্গ সেই বহুসমাদৃত রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন; বর্তমান 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামান্তরে সেই 'আজ এবং আগামীকাল-গ্রন্থেরই' পরিবর্ধিত সংস্করণ।

শিবরামবাবু নিজেকে পণ্ডিত ভাবেন না, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে তাই 'পণ্ডিতিয়ানা' কোথাও দেখাননি; সহজ সংশ্লেষণবুদ্ধি তাঁর বৃত্তিগত—সাবলীল রচনায় তাঁর সূক্ষ্ম মননশক্তি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, ভঙ্গিকে মনোজ্ঞ করেছে।

'আজ এবং আগামী কাল'-এর পরবর্তী রচনাগুলি অধিকাংশই সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তরছলে লিখিত এবং 'নবশক্তি' ও দু' একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংকলনে 'সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান'—'সুপারম্যানিয়া'—'কবি-জয়ন্তী'—'সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক'—'বিজ্ঞানের সার্থকতা'—'হরিজন আন্দোলনের নবদর্শন'—এই রচনাকয়টি নূতন সন্নিবিষ্ট হ'ল। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি 'আজ এবং আগামী কাল' থেকে সংগৃহীত।

আশা করি, উৎসাহী পাঠকসমাজে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' উপযুক্ত সমাদর লাভে সমর্থ হবে।"

এখানে উল্লেখ থাকে যে, মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি-র সাহিত্য-সম্পর্কিত

নিবন্ধগুলি আলাদা বই হয়ে বেরুবে বলে এই সংস্করণ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এই লেখাগুলি যখনকার, তখন কমিউনিজমের নামগন্ধও এদেশে ছিলনা, (কিম্বা নাম-গন্ধই খালি ছিল); মার্কসীয় সাহিত্যেরও আমদানি হয়নি। এই নামমাত্র কমিউনিজম্ সম্বল করে, ঐ-তত্ত্বে ওয়াকিব্‌হাল্ না হয়েও যে আমি কলম ধরতে পেরেছিলাম তার কারণ সাম্যবাদ আসলে এদেশেরই চারা—বিদেশের কলম্ নয়। বিদেশী কমিউনিজ্‌মের বাস্তব চেহারা যাই কেন হোক্ না, তার আদর্শবাদী-যে রূপ তা ভারতীয় মনেরই অনুরূপ। সাম্যের মূল ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত, তার অন্তর-গতি আমাদের মনের ফল্গু ধারায়। সমস্ত মানুষের সমত্ব আর মানুষের প্রতি মমত্ব—এই-বোধের দৃষ্টি এখানে এতই সহজ যে এর জন্য মার্কসীয় দর্শনের অপেক্ষা রাখে না। উপনিষদে উপ্ত, আর বুদ্ধদেবে অঙ্কুরিত হয়ে গান্ধিজীতে এসে তা শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত হয়েছে। গান্ধীবাদই, আমার মনে হয়, কমিউনিজ্‌মকে সম্পূর্ণ করতে পারে। একদিন তা করবেও। ভারতীয় আত্মিক-সাম্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আর্থিক সাম্য-নীতির আত্মীয়তা ঘটলেই বিশ্বজনীন সাম্যবাদের সাফল্য ঘটতে পারে। আর, ঘটবেও তাই।

আমার এই-লেখাগুলির মূলকথাও ছিলো ঐ। এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ—'আজ এবং আগামী কাল'-এর গোড়ায় যা আমি বলেছিলাম—সেই ভূমিকাটিই এখানে হুবহু তুলে দেয়া হোলো :

"স্বাধীনতা আজ দূরে, তাই দূর থেকে তাকে আজ লক্ষ্যের (goal) মতো দেখায় বটে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করলে দেখতে পাবো সেইখানেই আমাদের পথ ফুরোয়নি। তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করাই হবে লক্ষ্য। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানেই আমাদের গতি-সমাপ্তি নয়, তার পরেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

"রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রভেদ আছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে রাশিয়া তার কর্ম-সাধনার ফলে সর্বমানবের যে-কল্যাণ আহরণ করছে তার থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখতে হবে। রাশিয়া প্রত্যেক মানুষের মুখে রুটি দেবার ব্যবস্থা করেছে; কিন্তু যেহেতু রুটি দেওয়াটা অতি তুচ্ছ কাজ, তার

চেয়ে অমৃত দেওয়া ঢের বড়ো। সেইজন্য রাশিয়ার অর্থনীতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতের আভিজাত্যিক আত্মসম্মানে ঘা লাগবে, একথা মানতে পারিনে। প্রত্যেক মানুষকে যদি অমৃতের সন্ধান দিতে পারি সে তো ভালোই, কিন্তু আগে তাকে রুটির সন্ধান দিয়ে তার পরে।

"ভারতের বৈশিষ্ট্য আছে, ঐশ্বর্য আছে,—ভারতেরও মানুষকে দেবার নিজস্ব-কিছু আছে, একথাও অস্বীকার করবো না। ভারতকে অমৃতের সন্ধানই দিতে হবে। এবং এই জন্যই, জগতের সভ্যতায় রাশিয়ার কাজ যেখানে শেষ হয়েছে, একমাত্র সেখানেই ভারতের কাজ সুরু হতে পারে। রাশিয়া মানুষকে ভাণ্ড যোগালেও ভারত সেই ভাণ্ডে অমৃত-রস বিতরণ করতে পারে। এই জন্যই সমাজতন্ত্রের পথকে এড়িয়ে গেলে আমাদের চলবে না, সে-পথ আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে।"

অবশেষে একটি কথা। কথাটি বিশ্বভারতীকে নিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে 'কবিজয়ন্তী'তে একটি অপবাচক বাক্য ছিলো (এখনো আছে), লাইনটি এবারে আমি তুলে দিতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই দিইনি। সে-যুগের এক লেখকের উদ্ধত রূপের উদাহরণ-স্বরূপ রেখে দিয়েছি। কিন্তু একথা আমি এখানে বলতে চাই যে বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথের অপকর্ম বলে এখন আমি মনে করিনে। মনে করি, এটা তাঁর অপত্য-কর্ম। জাতির পিতৃজনোচিত তাঁর বিপুল সৃজনীশক্তির পরাকাষ্ঠা ঠিক এ না হলেও তার বিরাট বাৎসল্যের একটা পরিচয় যে, তার ভুল নেই। স্রষ্টার সব-সৃষ্টিই, বা সৃষ্টির সবটাই কিছু নিখুঁৎ হয় না, তা নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করার কোনো মানে হয় না।

সিগ্‌নেট প্রেস্ (তাঁদের টুকরো কথায়) 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'-বইটিকে 'সুখপাঠ্য লাঠালাঠি' বলে উল্লেখ করেছেন। সুখপাঠ্য কতখানি তা জানিনে, তবে এটাকে লাঠালাঠি বলতে আমি নারাজ। এ-বইকে কেউ যদি সিরিয়স্‌লি নেন্ তবে সেটা তাঁর সিরিয়স্ মনের—নিজগুণেরই পরিচয়। তেমন মারাত্মক গুরুত্ব আমার কোনো লেখার আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার নিজের মতে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' হচ্ছে, মস্কো নিয়ে পণ্ডিতি, আর পণ্ডিচেরি নিয়ে মস্করা।

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি

সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশিল্পী নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এবার ''বোলশেভিকির' বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন—'আত্ম-শক্তির পৃষ্ঠায় তিনি ধ'রে নিয়েচেন বোলশেভিকবাদ existing order-এর বিরুদ্ধে। এবং তাই তিনি নিজেকেও ওর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েচেন।

গোড়াতেই বলে রাখি, বোলশেভিকির পক্ষসমর্থনের জন্য আমি কলম ধরিনি ; কেননা বোলশেভিজম্ অনেক বড়ো বড়ো আক্রমণ সয়েও টিকে আছে এবং আশা করি নলিনীবাবুর ধাক্কাও সে সামলে উঠবে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়েচি গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি আমাদের ঘরোয়া সাবেক জিনিষদের রক্ষা করতে। কারণ নলিনীবাবু যে-ভাবে গীতা-উপনিষদের মতো অতি পুরোণো মাপকাঠি দিয়ে বোলশেভিকির অতি আধুনিক ও অত্যন্ত বিরাট বিশ্বরূপ মাপতে লেগেচেন তাতে আমার আশঙ্কা হয়, মরচে-পড়া কাঠিগুলি না মচ্‌কে যায়! মনে হয়েচে তাঁর মানদণ্ডের প্রাণদণ্ড দিতেই যেন তিনি মরীয়া।

আমার বিশ্বাস, গীতা-উপনিষদের তত্ত্ব দিয়ে বোলশেভিকির তত্ত্বের বিচার হতে পারে না, যেমন বোলশেভিকির মতবাদ দিয়ে গীতা-উপনিষদের তত্ত্ব-নির্ধারণ অসম্ভব। দুটো একেবারে আলাদা জিনিস—স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। বোলশেভিকির বিরুদ্ধে নলিনীবাবুর

> 'প্রধান অভিযোগ এই যে, উহা নাস্তিক্য-বুদ্ধি, গীতার কথায়, তামস-জ্ঞান-প্রসূত।'

কেননা, 'মানুষ-যে দেবতা, মানুষ-যে ব্রহ্ম, মানুষ-যে ভগবান স্বয়ং—এই সকল কথা তাহার কাছে কেবল যে অবান্তর এমন নয়, ইহাদিগকে সে মনে করে মানুষ-মারা বিষ-মন্ত্র।'

তাহলে বোঝা যাচ্চে, নলিনীবাবুর মতে, মানুষ-যে দেবতা, মানুষ-যে ব্রহ্ম, মানুষ-যে ভগবান স্বয়ং—এই সকল 'অতিবাস্তব সত্য' কথায় দৃঢ় বিশ্বাসই হচ্চে একমাত্র দিব্য জ্ঞান ; এবং বোলশেভিকরা যদি মনে করে মানুষ কেবলমাত্র মানুষ, তার বেশি কিছু নয়, এমন-কি দেবতা, ব্রহ্ম ও ভগবান—তিনটার একটাও সে নয়—তাহলে সেটা তাদের নাস্তিক্য-বুদ্ধির রীতিমতো বিজ্ঞাপন! পৃথিবীতে nonsense এর proportion খুব বেশি—তাব মধ্যে বাস করে sense of proportion রাখাটা-যে ঘোরতর তামসজ্ঞানের পরিচয়—এ কথায় নলিনীবাবুর সঙ্গে আমি একেবারে একমত। তবে এগুলো ঠিক 'মানুষ-মারা বিষ মন্ত্র' কি না—এ বিষয়ে ঈষৎ সন্দেহ আমার থেকেই যাচ্চে, কেননা চোখের ওপর দেখচি এই বিষ-মন্ত্রে, অনেকগুলি গুণী ব্যক্তি, মারা না পড়ুন, দস্তুরমতো কাবু হয়ে রয়েচেন! কৈবল্য উঁচুদরের প্রাপ্তি, পরাকাষ্ঠার চূড়ান্ত,—বস্তুতই তা শূন্যভেদী। সেই কেবলতা লাভ করতে গিয়ে ক্যাব্‌লামো পেয়ে বসেছে তাঁদের।

গীতা-উপনিষদের বাক্য আমরা নির্বিবাদে ও নির্বিচারে মেনে নিই, কেননা ওসব প্রাচীন ব'লেই সত্য এবং সম্ভবত সত্য ব'লেই প্রাচীন। কিন্তু এও তো মিথ্যে নয় যে, আর সব কিছুর মতো সত্যেরও জন্ম, যৌবন ও বার্ধক্যের কাল আসে—সেও যথানিয়মে নবীন সত্যকে স্থান ছেড়ে দিয়ে শেষে প্রাচীন পুঁথির মিউজিয়মে—সনাতন কবরখানায়—দেহরক্ষা করে। সত্যসত্যই যদি কোনো কালে মানুষ ভগবানরূপে দলে-দলে বিচরণ ক'রে থাকে, এখন আর তাদের সশরীরে দেখতে পাওয়া যায় না;—কাজেই নলিনী-বাবুর কথিত সত্য এখন আর জীবন্ত হয়ে নেই, পুঁথির পাতায় নির্বিকল্প আশ্রয় গ্রহণ করেচে। সুতরাং দুঃখ যতই সূক্ষ্ম হোক, যা নেই—তা নিয়ে, যা আছে তার সঙ্গে লড়াই করাটা অসাধারণ আস্তিক্য-বুদ্ধির পরিচয় হতে পারে, কিন্তু এই ধরণের রেষারেষির শেষাশেষি প্রায়ই খুব সুবিধার দাঁড়ায় না। পরশুরাম বড়ো লড়ায়ে ছিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র ছিলো তাঁর; কিন্তু গত পরশুরামকে নিয়ে আজ আর কোনো আরাম নেই।

আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল মার্কসের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেচে—পুরাণো গীতার কোনো বচন দিয়েই এই নূতন গীতার সৃষ্টিশক্তির পরিমাপ করা যায় না। সব্যসাচীর

জাতি-বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী-সংগ্রামের বিশ্বক্ষেত্র ঢের বড়ো—আদর্শের দিক দিয়ে, তত্ত্বের দিক দিয়ে ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলবো এই জন্যে যে, তিনি তার কঠোরতর সাধনায়, সবলতর বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙে গুঁড়িয়ে, গুঁড়োর থেকে নতুন ক'রে গড়তে পেরেছেন। এই ভাঙা-গড়ার অনিবার্য ফলে যদি নলিনাবাবুর 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই দ্বিজাতি বা অভিজাত বর্ণত্রয়ের বিলোপ' ঘ'টে থাকে, তবে তার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই ঘটেচে। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। (১)

(১) নলিনবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমিও ফুটনোটে (যদিও অপরের) একটু বাক্য সংযোগ করলুম:

He (Lenin) is a saint, a seer, a practical idealist who saw the vision of a better saner and healthier humanity and brought out a world-revolution which has already swept away many a throne and kingdom, shattered to pieces many a time-honoured and cherished institutions, established a new order and made a complete readjustment of things economic, social and political.

Despised by some, defied by others—a terror to oppressors and exploiters, and a saviour to the oppressed and exploited—this enigmatical personality is still a force, even after five years of his death, before which the old world with all its time-worn philosophy and paraphernalia of pomp and power is daily losing its footing.

নলিনীবাবু তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেচেন

'অন্তরের ভাবে ও ধর্মে তাহারা (বোলশেভিকরা) শূদ্রই।···নূতন শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়া বোলশেভিক তাহার নূতন সমাজের পত্তন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা হইতেছে যাহাকে বলে, পিরামিডকে তাহার চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দুশ্চেষ্টা। ফলতঃ নূতন সমাজের সৃষ্টি সম্ভব একমাত্র নূতন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি দিয়া—'

এখানে 'ফলতঃ' নিয়ে মূলতঃ একটু গোলযোগ। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই প্রমাণ যে, নূতন সমাজের সৃষ্টি হতে পারে একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই। আর তাদের নূতন সৃষ্টির দরকার নেই, দরকার সুধু তাদের নূতন দৃষ্টির। পৃথিবীর আদি সমাজ, আদি সভ্যতা কৃষকের লাঙলের ফালেই গ'ড়ে উঠেছিল; আজ পর্যন্ত সভ্যতার যা খাঁটি সোণা তা উদ্ধার করচে শ্রমিকরাই, তাতে পালিশ লাগাচ্চে নলিনীবাবুর 'অভিজাত বর্ণত্রয়' এবং গিল্টিও চালাচ্চে তারাই। কিন্তু নলিনীবাবুদের দলগত মতিগতি এমনই জলবৎ তরল যে, এই গিল্টি কন্‌সেন্সটা কখনোই তাদের মনে কোনো আঁচড় কাটে না।

রাশিয়ার কথা ছেড়েই দিই,—রাসলীলায় ভারী কড়াকড়ি—কিন্তু আমেরিকার নূতন সমাজ কাদের সৃষ্টি? ইউরোপ থেকে যে সব শূদ্রের দল আমেরিকায় চাষবাসের পত্তন করতে গিয়েছিল

তাদের। আদিযুগের আর্যাবর্তেরও সেই একই ইতিহাস. সমাজসৃষ্টির গোড়ায় থাকে শূদ্রের শক্তি—পরে সেই সমাজের শোষণ, শাসন এবং নিছক শোভাবর্ধনের জন্য যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের উদয় হতে থাকে। সমাজের মতো বিরাট সৃষ্টি একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই সম্ভব। ব্রাহ্মণের দ্বারা হতে পারে দু'একটা সঙ্ঘ, আশ্রম বা আড্ডা—বড়ো জোর এক-আধটা নৈমিষারণ্য বা পণ্ডিচেরি-মার্কা আধুনিক ব্যাসকাশি।

যারা বিজ্ঞানের নজরে কিছু দেখে না, ইতিহাসের নজির তাদের চোখে পড়ে না। তাই নলিনীবাবু 'নূতন শূদ্র দ্বারা নূতন-সমাজ-পত্তনের চেষ্টা'-কে বলছেন—

'পিরামিডকে তাহার চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দুশ্চেষ্টা। ফলতঃ নূতন সমাজের সৃষ্টি সম্ভব একমাত্র ব্রাহ্মণের সৃষ্টি দিয়া—'

অথচ, নলিনীবাবু আরেক জায়গায় স্বীকার করেছেন

'বোলশেভিকরা তাহাদের রাষ্ট্রে তাহাদের সমাজের যে বিশেষ বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা নূতন প্রণয়ন করিতেছে···সে সমস্তই, হয়ত সামান্য অদলবদলের ফলে, আদর্শ সমাজের রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা হইয়া উঠিতে পারে।'

কিন্তু হলে কী হবে, সে সবই-যে শূদ্রের সৃষ্টি! 'ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদের' সঙ্গে পরামর্শ করে এবং 'অভিজাত বর্ণত্রয়ের'

সাহায্য নিয়ে যদি করতো তাহলে নলিনীবাবুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু কাউকে না বলে-কয়ে নিজেরাই সব করে ফেলা এ যে নিতান্তই হঠকারিতা! পণ্ডিচেরির ব্রাহ্মণেরা (নয়া পেটেণ্ট) নূতন সমাজের সৃষ্টি করবেন বলে বহুদিন থেকে হাত ধুয়ে বসে আছেন; তাঁরা কী করচেন-না করচেন তা না দেখেই, তাঁদের উপদেশের অপেক্ষা মাত্র না রেখে—এমন কি, তাঁদের নোটিশ পর্যন্ত না দিয়ে, তাঁদের জগদুদ্ধারের একচেটে অধিকারে হাত দিতে যাওয়া অন্যায়ের চূড়ান্ত হয়েচে! তারা একটা দুরপনেয় দুরপরাধ ক'রে ফেলেচে সন্দেহ নেই; ভরসা এই, নলিনীবাবু নিজগুণে তাদের ক্ষমা করবেন।···তারা অবোধ, জানে না তারা কী করেচে!

অত্যন্ত অসহিষ্ণু তারা; কাল-রূপ অনন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে চিরন্তন যোগ রক্ষা করবার মতো অফুরন্ত আলস্যের তাদের অমার্জনীয় অভাব,—ধৈর্য, সংযম, তিতিক্ষা তাদের একবিন্দু নেই; তারা ভাবচে দুনিয়ার লোকের উপকার করার মহা দায় যেন তাদের ঘাড়েই অপেক্ষা করে আছে—সেটা হট্ করে করে ফেললেই হোলো! কিন্তু বাস্তবিকই তো তা আর না! মানুষের দুঃখকষ্টে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাড়াতাড়ি একটা-কিছু করতে গেলেই কি-আর সেটা টেঁকে?—তাতে অন্য সব সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টিকামীদের সুধু চিত্ত-চাঞ্চল্যই জাগে, তাঁদের তপোলব্ধ নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকার

শান্তিরই খালি বিঘ্ন ঘটানো হয়, তার বেশি কিছু নয়।

নলিনীবাবু তো স্পষ্টই বলে দিচ্চেন—

> 'অন্তরাত্মার হিসাব আগে না করিলে, বাস্তবের স্থুল-রূপের আদি উৎপত্তি যে সূক্ষ্ম চিন্ময় লোক, সেখানে বীজ বপন না করিয়া আসিতে পারিলে, সকল শ্রম পণ্ড হইতে বাধ্য। জগতে যে-দুঃখ দেখিয়া বুদ্ধদেব পথের ভিখারী হইয়া গিয়াছিলেন—সেই দুঃখ দূর করিয়া, দুঃখের সমাজকে সুখের সমাজে পরিণত করা কেবল জড়বুদ্ধির কাজ নয়, প্রয়োজন অন্যরকম সাধনার।···বোলশেভিকরা তাহাদের দেশের জন্য বা জগতের জন্য-যে স্থায়ী সম্পদ কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিবে তাহা মনে হয় না—সে কর্মের কৌশল তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই।'

নলিনীবাবুর ভাবখানা অনেকটা এইরকম: আধুনিক শূদ্রের স্পর্ধা ছাখো, তারা এসব তত্বকথা মানতেই চায় না! হোক-না-কেন এই 'শূদ্রবর্ণা পৃথিবীতে' তাদের সংখ্যাই সাড়ে-পনেরো আনা, তবু তো তারা সেই 'কৃষক আর মজুর'! অভিজাত অর্ধ-আনাকে ছেঁটে ফেলে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করা কি তাদের উচিত হয়েচে? এতদিন এই 'অভিজাতদের' সুশাসনে চিৎ হয়ে কেমন সুখে কালাতিপাত

তারা করেছিল—তার বিনিময়ে কিনা এই! ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে নেহাৎ তোরা ছোটোলোক!

তারপরে 'চিন্ময় লোকে বীজ বপন' করা দূরে থাক,—এতকাল ধরে 'চিন্ময় লোকে বীজ বপনের' ফলে যে সব সনাতন শস্যে ধরিত্রী ভারাক্রান্ত, আগে কিনা তাদেরই কর্তনে লেগেচে! সেটাই যেন তাদেব প্রথম কর্তব্য! অথচ সনাতন আমাদের ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচিন্তার সঙ্গে অর্থচিন্তার কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন—একধারে যেমন উপনিষদ গীতা, অন্যধারে তেম্নি মনুসংহিতা; একদিকে যেমন বড়ো বড়ো তত্ত্ব, অপরদিকে তেম্নি ব্যক্তিনির্বিশেষে অন্নপ্রাশন থেকে শুরু ক'রে বেচারার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক ট্যাক্সো আদায়, এমন কি, বহুকাল আগে খতম্ হয়ে গেলেও তার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে মড়া মাথার ওপর বংশানুক্রম জিজিয়া; দুর্গ্রহক্রমে এই ভূগ্রহে জন্মাবার ও মরবার পাপের শাস্ত্রমতো প্রায়শ্চিত্ত—সেই যে আমাদের ছিল ভালো! বোলশেভিক শূদ্ররা নিজের দেশের ব্রাহ্মণদের তো লোপ করেইছে; আমাদের ব্রাহ্মণদের এইসব চিরকেলে ব্যবসা, বিনা পুঁজির ফলাও কারবার—এসবও লোপাট করবে নাকি? তাহলেই তো গেছি!

তারপর ক্ষত্রিয়। কেমন তারা দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তি বাধিয়ে রাখত—তাদের নব নব কুরুক্ষেত্র পৃথিবীতে শূদ্রাধিক্যের কত বড়ো অমোঘ ঔষধ ছিল, আর তাদেরই

কিনা বিলোপ করা! কেউ হয়তো বলবেন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি যখন রইলই, তখন অস্ত্রচিকিৎসাটা উঠে গেলেও কিছু যায়-আসবে না। কিন্তু অমন দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয়রা যখন গেল, একদম্ দাঁড়াতে পেল না, তখন, শূদ্রদের অনাচারে, এই সব অভিজাত আধি-ব্যাধিরাও যে টিকে থাকতে পারবে, সে-ভরসা বড়ো নেই।

বেচারা বৈশ্যদের যা দুর্গতি করেচে, মনে করলেও কান্না পায়। অর্থ অনর্থের মূল—শূদ্রদের সেই অনর্থ থেকে রক্ষা করবার জন্যে মারাত্মক অর্থভার কষ্ট ক'রে নিজেরা এতদিন বহন করেচে; অবশ্য ভারমুক্ত হয়ে তারা বেঁচে গেল,—কিন্তু এইভাবে বাঁচানো? সম্পূর্ণ তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে—এর চেয়ে না বাঁচানোই-যে ভালো ছিল! শূদ্ররা যখন ধরিত্রীকে দোহন করে কেউ তখন একটি কথাও বলে না, কিন্তু বৈশ্যরা তাদের ধরে দোহন (exploit) করতে গেলেই কথা ওঠে! বৈশ্যরা শোষণ করবে, ক্ষত্রিয়রা শাসন করবে, আর ব্রাহ্মণেরা রকমফের করে দুটোই করবে—এই অপূর্ব 'সহযোগ ও সমবায়ের মধ্যে' যে অভিজাত সমাজের 'প্রাণ' ছিল, সেখানে 'দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ' আমদানি করে শূদ্রজাতরা কী সর্বনাশই না করলো!

মস্কোর কথা থাকুক, পণ্ডিচেরির দিকেই তাকাই এখন! সেখানকার 'নূতন ব্রাহ্মণেরা' 'চিন্ময়লোকে বীজবপনে'

যেমন অত্যধিক সময় নিচ্চেন তাতে অজন্মার ভয় একেবারেই করিনে! রাশিয়ায় ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত এই দেবভূমি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ত্র্যহস্পর্শ যদি কায়েম রাখতে পারেন তাহলেও হাঁপ-ছেড়ে বাঁচি! অন্তত আমরা তো রক্ষে পাই! আমরা অসহায় ভাবে তাঁদেরই মুখ চেয়ে রইলুম। বেটার্ লেট্ দ্যান্ নেভার্!

অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় অসত্য

সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেছিলেন, পণ্ডিচেরির চিন্তাধারার দ্বারা ভারতের কর্মশক্তি অভিভূত হবার আশঙ্কা আছে, তখন কথাটা তিনি মুখরোচক করে বলেননি, এইজন্যে তার ভিতরে অপ্রিয়তা অনেকখানি আছে। সুভাষবাবুর বক্তব্যের প্রতি-কথা বাদ দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারি, কিন্তু তার ভিতরে যে-সত্য তাকে কিছুতেই বাদ দিতে পারিনে। সুভাষবাবু সাহসভরে যে কথাটা ব'লে ফেলেচেন সেটা ভারতবর্ষে তাঁর একলারই ধারণা, এমন নাও হতে পারে; এরূপ মতামত হয়তো আরো দু'চারজন দু'পাঁচজনের কাছে প্রকাশ করে থাকবেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র যেখানে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি বলেচেন সেখান থেকে তা সবার কাণে পৌঁছেচে; সে-রকম ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, নীরব থাকলেই তাঁর অপরাধ হোতো।

সুভাষবাবুর আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ 'আত্মশক্তির' পৃষ্ঠায় নলিনী বাবুর গবেষণা 'তরুণের স্বদেশ সাধনা'। নেশন গড়া সম্বন্ধে তরুণের মনে বহুৎ আইডিয়া থাকতে পারে, কিন্তু নলিনীবাবু প্রবন্ধাকারে যা ব্যক্ত করেচেন, তা যদি সত্যিই এদেশের তরুণদের আইডিয়া হোতো তাহলে আমি অন্তত, এই পঞ্চাশ-অর্ধেই বানপ্রস্থে যেতুম! আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, এই-আইডিয়া একমাত্র নলিনী

বাবুর। তরুণের মাথার ওপর চারদিক থেকে নানারকম চাপ পড়চে একথা জানি, কিন্তু তার ফলে মস্তিষ্ক ফেটে-যে তার অপমৃত্যু ঘটেচে, এ দুঃসংবাদ এপর্যন্ত আমি পাই নি।

নলিনী বাবু তাঁর প্রবন্ধে অনেক রুচিকর কথা আমাদের শুনিয়েচেন তার মধ্যে সত্য কতখানি তা যাচাই করার প্রয়োজন আছে। কেননা কবিতায় যখন প্রিয়কথা শুনি তখন তার প্রিয়ত্বই যথেষ্ট মনে করি, সত্য সেখানে বাহুল্য; কিন্তু নিছক গদ্যে নলিনী বাবু যে-বস্তুর অবতারণা করেচেন তাকেও সেইভাবে গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি যে-অবিচার করা হবে, তাঁর কঠোর সমালোচনাও তার কাছে কিছু নয়। কাব্যলোকে ধোঁয়া উপভোগ করা চলে, কিন্তু গৃহলোকে ধোঁয়া, ছলনা করে কাঁদবার মস্ত সহায় হলেও, বাঁচবার পক্ষে মোটেই নয়।

কার্ল্ মার্ক্স্ ইতিহাসের ইকনমিক্ ব্যাখ্যা করেছিলেন; নলিনী বাবু এবার ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সুরু করেচেন। তিনি বলেচেন—

'জাপান যে রুশকে হাটাইয়া দিয়াছিল, তাহা কতখানি ইউরোপীয় সাজসজ্জার জোরে, কতখানিই-বা জাপানের প্রাচীন দীক্ষা, সনাতন ধর্মের কল্যাণে?…জাপান যে এত সহজে, এমন সম্পূর্ণরূপে রুশের মতো বিপুল বিভীষণ

শক্তিকে ছত্রছন্ন করিয়া দিতে পারিয়াছিল তাহার মূল কারণ স্থূল অস্ত্রশস্ত্রের যথাযোগ্যতার মধ্যে ততখানি নাই, (১) সে-কারণ আরও গভীরে,—বাহিরের ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে জাপান-যে নামাইয়া আনিতে পারিয়াছিল তাহার প্রাচীন অন্তরাত্মার ধর্মের কিছু প্রভাব, এই জন্যে।'

ভালো কথা, মেনে নিলুম, জাপানের জয়ের কারণ তার আধুনিকতা নয়, তার 'প্রাচীন দীক্ষা ও সনাতন ধর্ম'; কিন্তু আমাদের আর-যাই-থাক-নাই-থাক, ওই-দুটি বস্তুর অভাব তো কোনোদিনই ছিল না, তবে আমরাই বা কেন ইংরেজের মতো 'বিভীষণ শক্তির' সংঘর্ষে এমন কাবু হয়ে পড়লুম (২); জাপানের মতো তাদের 'ছত্রছন্ন' করে' দিতে পারলুম না?—আমাদের বরাতেই বা 'ভাগবত সত্তার' এহেন উল্টো বিচার হোলো কেন?

ধর্ম্ম ও দীক্ষা—এই দুটো বস্তুর যা কিছু প্রকাশ হবার তা-যে প্রাচীন কালেই হয়ে গেছে—একথা আর যেই মানুক, পৃথিবীর তরুণরা যদি মানে তাহলে তার চেয়ে করুণ আর-

(১) তাঁর এই মতবাদ কিরূপ মারাত্মক (অন্ততপক্ষে হতে পারত) তা পাঠক বিবেচনা করুন। ভাগ্যিস্, আমরা নিরস্ত্র জাতি তাই বাঁচোয়া! আসলে মামাই নেই তার আবার কাণা আর খোঁড়া। কিন্তু থাক্‌লে—?

(২) আমাদের 'প্রাচীন দীক্ষা ও সনাতন ধর্মের' কুম্ভকর্ণ-শক্তির ফলেই নয়তো?

কিছু হতে পারে না। আধুনিক যুগের ধর্ম ও দীক্ষা যদি প্রাচীন যুগের সঙ্গে না মেলে, সর্বপ্রকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তাতে এই গ্রহের ভূতপূর্ব অধিবাসীদের অসম্মান হয়ত হবে, কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের আসবার সম্মান আর সার্থকতা সেইখানেই। অতীতের চেয়ে বর্তমান বড়ো, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ—একথা তরুণেই বলে। একথা যদি না বলতো তাহলে যে-বিপুল ট্রাজেডি ঘটতো তার ম্লান আলোকে পৃথিবীর মুখ ভারী ম্রিয়মান দেখাতো।

নলিনী বাবুর দ্বিতীয় বাণী—

> 'ইউরোপের আসুরিক শক্তিকে যদি জয় করিতে হয়, তবে তাহা সম্ভব দুই পথে। এক ইউরোপের অপেক্ষাও বৃহত্তর অসুর হইয়া—আর না হয়, সত্যকার দেবশক্তি অর্জন করিয়া। প্রথম পথ দারুণ দুর্গম—সংঘর্ষের সন্তাপের অজ্ঞানের অকল্যাণের—বোলশেভিকরা জগৎকে এই পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাহা ছাড়া এসিয়ার পক্ষে এই পথ পরধর্মের পথ।'

বোলশেভিকদের উপর, দেখচি, নলিনী বাবুর রাগ কিছুতেই পড়চে না, রাগ মানচে না কিছুতেই। একবার অসুর বানিয়ে ছেড়েচেন; এমন কি, সেখানেই ক্ষান্ত হতে চাননি, একথাও বলেচেন যে, তারা জগৎকে সংঘর্ষের

সন্তাপের অজ্ঞানের অকল্যাণের পথে' নিয়ে যাচ্চে। অভিজাত অর্ধ-আনা এতদিন শূদ্র সাড়ে-পনের-আনার মাথায় হাত বুলিয়ে যেরূপ নিশ্চিন্ত আরামে কালাতিপাত করে এসেচে তাতে আজ তাদের সেই বর্ণাশ্রমের নিরঙ্কুশ গণ্ডি থেকে সশ্রম মুক্তি দিতে গেলে সংঘর্ষ ও সন্তাপ কিছু ঘটবেই ; —কিন্তু ঝড যেমন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম নয়, তেম্‌নি এই সন্তাপও দুর্দিনের। বৈষম্যের প্রথম বিক্ষোভ কেটে যাবার পর যখন পরিপূর্ণ সাম্য বিরাজ করবে তখনকার লোকে সমাজের সেই অবস্থাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে (যেমন রাশিয়ায় নিয়েচে); 'আমার পূর্বপুরুষ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন বা দরজা-ভাঙার মহারাজা ছিলেন!' এমন ক্ষোভ কারু মনে জাগবে না। তারপর, বোলশেভিজম্‌ জগৎকে অজ্ঞান ও অকল্যাণের পথে নিয়ে যাচ্চে—এ-কথাই বা নলিনী বাবু বলচেন কেন? জগতের জ্ঞান ও কল্যাণ বলতে আমরা এতদিন বুঝতুম জগতের বিশেষ দু'পাঁচ জন ব্যক্তির জ্ঞান ও কল্যাণ—আজ নির্বিশেষ সকলের জ্ঞান ও কল্যাণের পথ মুক্ত হচ্চে বলেই কি নলিনীবাবু ওই শব্দদুটির আভিধানিক মানে পালটে দিতে চান?

সাম্যবাদকে যাঁরা রাশিয়ার আম্‌দানি ভারতের পক্ষে পরধর্ম বলেন তাঁরা গোড়াতেই একটা ভুল করেন। বর্ণাশ্রম লোপ ক'রে বুদ্ধদেবের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁরা প্রথমেই

বিস্মৃত হন। অতীতের কথা ছেড়েই দিই, বর্তমানে মুসলমানরাও-যে এই ভারতেরই অধিবাসী এবং তাদের মধ্যে সাম্যবাদ কোনো-না-কোনো রূপে অত্যন্ত সহজভাবেই বিদ্যমান—একথাও (৩) তাঁরা ভুলে যান। তারপর হিন্দুদের সনাতন যৌথ-পরিবার—তার ভেতরে আমরা কী দেখি?—কমিউনিজ্‌মের মূলসূত্র; সাধ্যমতো উপার্জন পরিবারে দেবে এবং প্রয়োজন মতো তা থেকে নেবে। গৃহ থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে গ্রামের মধ্যে এই কমিউনিজ্‌মেরই প্রাচীনরূপের একটা ক্রমবিবর্তিত বিকাশ ঘটেছিল—আজ যদি তাকেই আধুনিক জীবনের ও সমস্যার উপযোগী ক'রে বৃহত্তর সমাজে (অর্থাৎ সমগ্র দেশের মধ্যে) বিরচনা করা যায় তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে? বরং ইভোলিউশনের নিয়ম অনুসারে সেইটাই কি তার স্বাভাবিক পরিণতি নয়? বুদ্ধদেবের আমলে এই ভারতবর্ষেই যে সাম্যবাদের প্রথম সূচনা হয়েছিল আজ যদি সেখানেই তার সফলতা ঘটে সেটাই কি তার 'স্বধর্ম' হবে না?

না হয় তর্কের খাতিরে ধরেই নিলুম, সমাজ-তন্ত্রের রূপ সম্পূর্ণ বোলশেভিক সৃষ্টি; তবু ভারত যদি নিজস্ব প্রেরণায়, নিজের প্রয়োজনের তাগিদে ঐ-রূপকেই গ্রহণ করে তাতে

(৩) যদিও সেই একান্নবর্তী পরিবার এখন ৫২-বর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের বৈশিষ্ট্যই-বা যাবে কেন (৪) এবং তাকে অনুকরণ মনে ক'রে লজ্জিতই-বা আমরা কেন হব? দুটো লোক যদি বিভিন্ন পথে গিয়ে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছয় তাতে পরস্পরের কাছে খাটো হবার তো কারণ নেই। প্রাচীন যুগের জাতিরা পরস্পর-নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও যেমন তাদের মধ্যে সেকেলে-পনার একটা ঐক্য দেখতে পাই, এযুগের জাতিদের আধুনিকতার মধ্যে তেমনি একটা একাকৃতি থাকবে এইটাই ত স্বাভাবিক।

নলিনী বাবুর মতে কিন্তু, ভারতের পথ একেবারেই পৃথক্। দুনিয়ার আর সবাই যদি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বাঁচতে চায় আমরা চাইব দেবতা হতে কিম্বা অমানুষ থাকতে, অথবা এই রকম একটা ভাগাভাগি বন্দোবস্তে যে, গুটিকতক হবে দেবতা আর বাকি সব তাদের বাহন, কিম্বা উপদেবতা! (৫) এবং নলিনীবাবু সেই পথই আমাদের বাতলেচেন! তিনি বলচেন—

'দ্বিতীয় পথ (অর্থাৎ দেবশক্তি-অর্জনের পথ) এশিয়ার—ভারতের নিজস্ব পথ, স্বধর্মের পথ, পরম স্বস্তি পরম

(৪) যদিও আমি মনে করি বৈশিষ্ট্যের চেয়ে মানুষ বড়ো বৈশিষ্ট্যের গোঁড়ামির পায়ে মানুষের কল্যাণের বলিদান, আর যে-যুগেই চলে থাকুক, এ যুগে অচল।

(৫) কেননা আমার বিশ্বাস, দেবতা হওয়ার আর্ট-কে করতলামলকবৎ করা দু'চারজন বাহাদুরের পক্ষেই সম্ভব; বাকি সবাই হঠাৎ-দেবতা হবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ক'রেও দেবত্বের লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন না, অথচ এই হঠযোগ-সাধনের ফলে যে-অবস্থায় উত্তীর্ণ হবেন তাকে মানুষী অবস্থা বলে তাঁদের এবং মানুষদের অপমান করাও ন্যায্য হবে না, এই বিবেচনা করে তাঁদের more than man but less than God-এই উপ-যুক্ত আখ্যা দেওয়াই বোধহয় সমীচীন।

সিদ্ধি তাহাতে। ভারতের আদর্শ কর্মী, বিভূতি যাঁহারা, যাঁহারাই অসুর-রাক্ষসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারা দেখি সকলে চিরকাল প্রথমে দেবশক্তির নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়া তবে রণক্ষেত্রে নামিয়াছেন। আসুরিক শক্তি দিয়া অসুরকে জয় করা কখন সম্ভব হয় আবার কখন না'ও হইতে পারে ;···কিন্তু দেবশক্তির দ্বারা অসুরের যে জয় তাহা অব্যর্থ তাহা সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত,—এবং আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ভারত দেব-অংশ সম্ভূত।'

'দেবশক্তি অর্জন' বলতে নলিনী বাবু যে কী বোঝেন এবং কী বোঝাতে চান তা তিনিই জানেন! কতজন লোকের পক্ষে দেবশক্তি অর্জন করা সম্ভব তিনি মনে করেন? পৃথিবীতে সম্প্রতি ক'জন দেবতা হয়েছেন এবং ক'জন হবো হবো করছেন? তাদের ক'জনাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার বাকি দুইশ' কোটি লোকের কী গতি? তারা কি দেবতাদের বাণী শুনে আর পদসেবা করেই কৃতার্থ হবে? তাদের যখন দেবত্ব লাভের ভরসা নেই তখন কি মানুষের প্রাপ্য থেকেও তাদের বঞ্চিত থাকতে হবে? তাদের জন্যে তার কী ব্যবস্থা?

নলিনীবাবুর স্কুলের সঙ্গে লেনিনের স্কুলের তফাৎ এইখানে। নলিনী বাবুরা চোখের সামনে দেখেন তারই সগোত্র দু-দশজনকে; আর বোলশেভিকরা দেখে এই পৃথিবীর সব

মানুষকে। কাজেই একটা পথ যখন অন্দরের দিকে যায়, আরেকটা তেম্‌নি বিশ্বের দিকে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বপথের যারা যাত্রী, অন্দরের লোকদের তারা লক্ষ্যও করে না, আন্দরিকদের আন্তরিক দুঃখের কারণই এইখানে। এই জন্যই আন্দরিকদের আন্দোলন—বাইরের পথটা কিছু না, অন্দরের পথই সত্য; কিন্তু ভরসা ক'রে সেই পথে সবাইকে নিমন্ত্রণ করতেও পারেন না; কেননা বিশ্বশুদ্ধ মানুষ চলতে পারে সে-পথ তত বড়ো নয়। বিশ্বশুদ্ধ লোক যে-পথের যাত্রী হতে পারে না সে-পথ ব্যবহারের অযোগ্য,—যে-মুক্তি একা আমার, তার মতো করুণ প্রাপ্তি আর দুনিয়ায় নেই।

নলিনী বাবুর একটা আবিষ্কার কিন্তু খুব অদ্ভুত! তিনি বলেচেন—'ভারতের আদর্শকর্মী, বিভূতি যাঁহারা, যাঁহারাই অসুর-রাক্ষসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারা দেখি সকলে চিরকাল প্রথমে দেবশক্তির নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়া তবে রণক্ষেত্রে নামিয়াছেন।' রণক্ষেত্রে নেমেচেন তো বটে, কিন্তু একবারও-যে জিতেচেন পুরাণ-ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। অসুরের কাছে বারম্বার পরাজয়ই দেবতাদের দুর্ভাগ্য-লিপি! বোধহয় এই কারণেই, পণ্ডিচেরি দিব্য অস্ত্র লাভ করেও মস্কোর অসুরদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে নামতে এত ইতস্তত করচেন! তুরীয় লোকে দেবতারা সত্য হতে পারেন, কিন্তু মর্তালোকে তথাকথিত অসুরেরা ততোধিক

সত্য—তুড়ির সাহায্যে তাদের উড়িয়ে দেয়া যায় না! এবং যদিও নলিনীবাবু বড়ো গলা করে ঘোষণা করেচেন—'দেব-শক্তির দ্বারা অসুরের যে-জয় তাহা অব্যর্থ, তাহা সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত—এবং আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ভারত দেব-অংশ সম্ভূত'—তবুও আমরা তেমন ভরসা পাচ্চিনে। কারণ আমরা যদি দেবতাদের এতই সগোত্র, এতই আদরের, তবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খৃষ্টানের পায়ে আমাদের মাথাই বা এমন করে মুণ্ডিত হচ্চে কেন?' যখন দেখচি সেই পৌরাণিক যুগ থেকে এপর্যন্ত এ পৃথিবীতে অসুরেরই একাধিপত্য আর বোলবোলাও তাদেরই; এবং বেচারা দেবতাদের প্রায় বংশ-লোপ, অকৃত্রিম দৈব ভাষায়—'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'। তখন কী ক'রে আর বিশ্বাস রাখি যে, দেবত্বটাই সত্য আর অসুরত্ব কিছু না! বসুন্ধরাকে ভোগ দখল করতে হলে যখন আসুরিক হওয়া ছাড়া উপায় নেই, তখন তেমন মহাপাপ করার চেয়ে 'দেব বংশসম্ভূত' হতভাগ্য আমাদের উচিত দুর্লভ দেবত্ব বাঁচিয়ে শুভ দিন-ক্ষণ দেখে ধরাধাম ছেড়ে বরং অমর্ত্য লোকের দিকেই যাত্রা করা! সেটা আমাদের পক্ষেও ভালো এবং পৃথিবী পক্ষেও!

আধুনিক বোলশেভিকদের পৌরাণিক গাল দেওয়ার সার্থকতা আমি বুঝিনে। বেশি পরিমাণে মানুষ হওয়ার

জন্যেই কি তারা অসুর? লেস্ ছ্যান্ হিউম্যান্ হওয়াটাই কি দেবত্বের লক্ষণ? বোলশেভিকরা মানুষের দেহ ও মনের প্রয়োজনটা প্রথমে স্বীকার করে; এইজন্যই কি নলিনীবাবু তাদের অসুর বানাতে চান? আর, যেহেতু আমরা দেহকে তুচ্ছ করে আত্মা-আত্মা-রবে আকাশ ফাটাই সেই কারণেই আমরা দেবতা? দেহ যদি এতই অবাঞ্ছনীয় হয়, তাহলে এমন দেহ ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে আত্মস্থ হওয়াই আমাদের উচিত—তাতে দেহ ও আত্মা দুটোই মুক্তি পাবে এবং উভয়ের পক্ষেই সেটা খাসা!

আসলে, আত্মা হচ্চে দেহমনের সৃষ্টি। এই জন্যে বোলশেভিকরা দেহ-মনকে যদি আত্মার চেয়ে বড়ো ক'রে থাকে নিতান্ত ভুল তারা করে নি। অন্তর্গত গ্ল্যাণ্ডের সিক্রিশান্ দ্বারা যেমন দেহের ভেতরে যৌবনের সঞ্চার ঘটে, তেমনি দেহ-মন পরিপূর্ণ ও চরিতার্থ হলে তার অভ্যন্তরে যে ভাব-রস বিনিসৃত হয় তাকেই আমরা বলি আত্মা—সেই সহজ নিঃসরণের আনন্দবোধই আমাদের আত্মবোধ। আত্মার চেয়ে আত্ম-প্রকাশ বড়ো, যেমন সূর্যের চেয়ে সূর্যের আলো। দেহ মন সম্পূর্ণ ও সার্থক হলে আত্মার প্রকাশ সেখানে আপনিই হয়, কারু সাধাসাধির অপেক্ষা রাখে না; অতএব যেটা গোড়ার কাজ বোলশেভিকরা সেটাই যদি গোড়ায় করে থাকে সেজন্য তারা অনাত্ম নয়, অনাত্মীয় তো নয়ই—

এবং আত্ম-বিরোধী তাদের কিছুতেই আমি বলতে পারিনে।

অবশেষে নলিনীবাবুর শেষ কথাটি বলে আমার কথা শেষ করি। তিনি এই প্রিয় সংবাদটি আমাদের শুনিয়েচেন—

'আজ বিশ্বমাতা ভারতশক্তিরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছেন সমস্ত জগতে নূতন একটা জীবন, উর্ধ্বতর একটা চেতনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, পৃথিবীতে অভিনব সমাজ স্থাপন করিতে।'

বিশ্বমাতার প্রিয়পুত্র আমরা, জগত-সমুদ্ধারের যা-কিছু কাজ তা আমাদের দ্বারাই তিনি সম্পন্ন করবেন,—আমরা সব চেয়ে বড়ো, সব থেকে পেয়ারের—এইসব কথা ভাবতে ভারি আরাম; সেই-আরামের মধুচক্রে ঘা দিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ হয়, কেননা মধু-র ভাগ্য সেখানে নেই, হুলের তাড়না খুবই। এই দুর্ভাগা দেশে প্রিয় অসত্যই নিরাপদ, অপ্রিয় সত্য বলা এখানে বাহবা পাবার পথ নয়; তবু একথা বলতেই হবে যে, এই বৃথা গর্ব, এই অলস আত্মপ্রসাদ, এই মারাত্মক মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার সময় হয়েচে। নিজেকে সত্যি করে জানতে গিয়ে যদি নিজের অহংকারে ঘা লাগে, বেদনা বোঁধে, সেই আত্মবিদ্ধির আজ একান্ত প্রয়োজন।

নলিনীবাবুকে আমি এই ক'টি প্রশ্ন করি, বিশ্বমাতার এবম্বিধ বাসনার কথা তো বহুদিন থেকেই শোনা যাচ্চে, তবু

তাঁর প্রকট হতে এত দেরি কেন? সেজে গুজে আসতেই সময় লাগছে নাকি, বিশ্বপিতার সঙ্গে দাম্পত্য কলহের ফলেই এই লঘুক্রিয়া? তারপরে, এত দেশ থাকতে ভারতবর্ষের ওপরেই-বা তাঁর এমন পক্ষপাতিতা কেন? আর সব দেশ কি ভেসে এসেচে? এবং রাশিয়ায় ইতিমধ্যেই যে অভিনব সমাজ স্থাপন হয়েচে, তাতে-যে নলিনীবাবুর বিশ্বমাতার হাত নেই তাই-বা তিনি জানলেন কী করে? সেখানে কি বিশ্বমাতা প্রকটিত হতে পারেন না? বিশ্বমাতা একমাত্র ভারতেরই পর্দানসীন কি-না দয়া করে এ-সংবাদটাও তিনি আমাদের দেবেন!—ভারতের অন্তঃপুর ছাড়া বিশ্বপথে তাঁর গতিবিধি নেই এটা নিশ্চিতরূপে জানতে পারলে আমরা নিশ্চিন্তরূপে ঘুমোতে পারি।

সর্বশেষে আমি এই বলতে চাই যে, আজকের তরুণকে সর্বতোভাবে আধুনিক হতে হবে; তার মধ্যে যতটুকুতে প্রাচীনতা থাকবে ততটুকুতেই হবে মৃত্যুর অধিকার। বার্ধক্য ভালো, কিন্তু যৌবনের চেয়ে ভালো নয়; কেননা তা সৃষ্টি-শক্তিকে বন্ধ্যা আর দৃষ্টি-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে। নদীর পক্ষে নিত্যকার জল-ধারাই সত্য, প্রত্যহের সূর্যকর থেকে তার যোগান্ আসে; তার দুই কূলে যে-সনাতন বালু মোহ বিস্তার করচে, আত্মহারা হয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেই তার মৃত্যু—এই প্রাচীন বালুকে প্রতি মুহূর্তে অস্বীকার ও অতিক্রম করে

এগিয়ে যাওয়াতেই তার গতিমান জীবন। তার চলদ্দশা চালু। বালুকার প্রাচীনতা সে মানতে পারে; তার শাশ্বত স্থাবরত্বকেও দূর থেকে নমস্কার করা যায়, কিন্তু তার খাতিরে নিজের জীবনের —নিজস্ব গতিবিধির—পরাভব কিছুতেই না।

আজকের তরুণের কাজ, বিশ্বমাতার জন্যে অপেক্ষা করা নয়, তাঁর দায়িত্বভার নিজের কাঁধে নেওয়া; অভিনব সমাজ স্থাপন করাই আজকের তরুণের সাধনা। এর জন্য যদি সংঘর্ষ বাধে, সন্তাপ জাগে, তার আঘাত তার আঁচ থেকে পিছিয়ে থাকা তাদের চলবে না। এর থেকে আত্মরক্ষার লোভে যাঁরা কর্মস্থল ছেড়ে মর্মস্থলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক চিন্ময়-লোকে বীজ-বপন-কার্যই নিরাপদ মনে করবেন তাঁদের ভাগবত-বুদ্ধির প্রশংসা করে মৃন্ময়-লোকে যে-দায় আজ নিদারুণ হয়ে উঠেছে তার মোচনেই তাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে—তা হচ্চে আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজ সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করা; কেননা, এই বিনাশের দ্বারাই অতীত বর্তমানের ক্ষেত্রে ফলবান হবে। ('মহতী বিনষ্টি'—একথা কি উপনিষদ এই মহাকাণ্ডকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন?) এর চেয়ে মহত্তর বিনাশ আর হতে পারে না। বীজের বিলুপ্তি বনস্পতির অঙ্কুরতার পক্ষে যেমন জরুরি, অতীতের বিলুপ্তি বর্তমানের সার্থকতার পক্ষে ঠিক তেমনিঃ প্রাচীন সমাজের নিশ্চিহ্ন বিলোপ না ঘটলে নতুন সমাজের পত্তন সম্ভব নয়।

দো রোখা !

এবার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় ও শচীন সেন! (১) দুর্ধর্ষ বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয় এতদিন একা একরোখা লড়ে এসে অবশেষে শ্রান্ত হয়ে নিরস্ত হয়েচেন—এবার রুখেচেন এঁরা দুজন! এবার আর রক্ষে নেই, কেননা নলিনীবাবুর মতো এঁরাও বোলশেভিকদের প্রতি এঁদের অন্তরের অমার্জনা যেভাবে অমার্জিত ভাষায় প্রকাশ করতে লেগেচেন, তাতে তারা যদি একটুও ভদ্রলোক হয়, পৃথিবী থেকে মানে মানে বিদায় নেবেই। তবে তারা কী—? সেই এক প্রশ্ন! কিন্তু সে প্রশ্ন থাক্।

মহেন্দ্রবাবুর রায় এই যে,

'বলশেভিক সমাজ মানুষের জীবনকে বন্য পশু-জীবনেরই একটা সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দান করিতে চাহিতেছে'।

বন্য-পশুদের মহেন্দ্র বাবু অনায়াসেই অপমান করিতে পারেন, কেননা তার জন্য সভ্য পশুদের আদালতে বা আন্তর্জাতিক এজলাসে তারা মানহানির অভিযোগ আনতে যাবে না। কিন্তু তাদের তরফ থেকে আপত্তি এই ওঠে যে, 'আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির' ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে

(১) 'আত্মশক্তি' চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'বলশেভিক গণমানব' এবং ১৩৩৬ সালের বোশেখের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত শচীন সেনের 'সোশ্যালিজম্'—দ্রষ্টব্য।

তাদের নিবিড় ঐক্য থাকলেও বিচ্ছেদ এইখানে যে, এখনো তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে পরস্পরকে সভ্য প্রথায় উচ্ছেদ করতে শেখেনি। অতএব, মানুষের দরবারে তাদের দর বাড়ানো না গেলেও, মহেন্দ্রবাবু কি এই আপত্তিকর মন্তব্যের জন্যে পশুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন? অন্তত এটুকু আমি তাঁর সভ্যতার কাছে আশা করতে পারি?

মহেন্দ্র বাবু বলেচেন,

'বলশেভিক গণমানব সকল মানুষকে তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্তর হইতে নামাইয়া আনিতে চায়।'

অবশ্য এটা তাঁর মনে হয়।' কিন্তু মনে হওয়ার চেয়ে বড়ো সত্য যখন আর নেই এবং তার ওপরে যে-কোনো তত্ত্বই নির্বিবাদে যখন খাড়া করা চলে তখন আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। 'বলশেভিক গণমানবের' বিরুদ্ধে মানুষকে পশুতে পরিণত করবার অভিযোগ এইজন্যে যে, লেখকের মতে তারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বাধা সৃষ্টি করেচে। 'ভগবান নাই, আত্মা নাই, মৃত্যুর পরে সত্তার কোনো পরিণতি নাই, অতীন্দ্রিয় কোনো রহস্যলোকের আকর্ষণ নাই—' বোলশেভিকদের এতগুলি 'নাই';—মহেন্দ্রবাবু বলতে চেয়েচেন এই বিপুল নাস্তিক্যের ভারেই পাশবিক সোভিয়েট রাজ্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ মারা যেতে বসেছে।

হায় হায়, এতদিন ধরে 'ভগবান, আত্মা, মৃত্যুর পরে সত্তা, এবং অতীন্দ্রিয় রহস্যলোক' এরা সবাই সমবেতভাবে উপস্থিত থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে যে-কটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হোলো আঙুলে তাদের গোণা যায়—এখন এ-কটাও যদি উপে যায়, জগতের তবে উপায় ?

আমি বলবো, এ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ জন্মেচে যারা ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে যেতে পাবে নি, সে-ক্ষতিও যদি ধরিত্রীর সয়ে থাকে, তখন মুষ্টিমেয় বাকী কজনেরা যদি সেই-গতিই হয় সে-তো বোঝার পরে শাকের আঁটি! অবশ্যি ভগবান, আত্মা—এরা ব্যক্তি নয় এবং ব্যক্ত নয়, কিন্তু না হোক্, মহেন্দ্র বাবুর মতে, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে এনাবাই পরম সহায়। তাই-ই তো হবে, কেননা স্বর্গ-সৃষ্টি করতে যে-বস্তুর সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্চে উপসর্গ।

কিন্তু, সত্যই কি কমিউনিজ্ম্ ব্যক্তিত্বের পক্ষে বাধা ? ব্যক্তিত্ব-বিকাশের গোড়ার কথা ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য, তা নইলে সে নিজেকে ব্যক্ত করতে পাবে না। মানুষ যখন দরিদ্র, আর্থিক জীবনেই হোক, আর আত্মিক জীবনেই হোক্, তখন তার কোনো ছন্দ নেই, তখন সে ছন্নছাড়া। অন্নচিন্তা এবং অর্থ-চিন্তা মানুষকে এমন চমৎকৃত করে রাখে যে, বাইরের তাল সামলাতে গিয়ে অন্তরের তালা খোলার সময় সে পায় না। আত্মিক দারিদ্র্য দূর করবার আপাতঃ দায়িত্ব

কমিউনিজ্‌মের নয়, আর্থিক দারিদ্র্য দূর করাই তার প্রথমতম কাজ। অর্থলোকে সে আনতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য, অন্তর্লোক স্বচ্ছন্দ হবে তার ফলেই। আপনার থেকেই হবে। বাঁধ ভেঙে দিলে নদীর জল বাধ্য হয়ে স্বতই যেমন ছড়িয়ে পড়ে। তখন কেবল দু'এক জন নয়, নিখিল ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে; সেই সার্বজনীন সমার্থকতার পথেই সকলের সার্থকতা দেখা দেবে।

কমিউনিজ্‌ম্ মানুষের যে-মুক্তি এনেচে তা হচ্চে সশ্রম মুক্তি। সবাকার অন্ন সে যোগাবে, কিন্তু তার জন্য সবাইকেই খাটতে হবে। এখন, পৃথিবীতে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন যাঁরা শ্রম করতে নিতান্তই নারাজ—এইটেই তাঁদের 'ব্যক্তিত্ব' বোধহয়। এঁরা তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়াল্‌স্; কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে এঁদের ঐক্যতান এই যে, ব্যক্তিত্ব এতই ঠুনকো জিনিষ যে, খাটালে মারা যায়। শ্রমে তার মুক্তি নেই, আলস্যেই স্ফূর্তি; তাকে খাটানো নয়, তার জন্যে খাট্ আনো!

কেউ-তাঁরা বলবেন যে, দৈহিক শ্রমে বাধা নেই, কিন্তু বাধ্যতামূলক হলেই হয় ব্যক্তির অপমান। দৈনিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়ে আমরা ডান হাতের পরিশ্রম করি. এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; তেম্‌নি সামাজিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়ে যদি আমরা দুই হাতে খাটি সেইটাই কি হবে অপমান?

ক্ষুধা উচ্চবস্তু না হতে পারে কিন্তু তুচ্ছ বস্তুও নয়—ক্ষুধার দাবীই সুধার অধিকারকে টেনে আনে।

দিন ছ-ঘণ্টা ষ্টেটের জন্য খেটে দিয়েই আমি খালাস, বাকি আঠারো ঘণ্টা আমার ব্যক্তিত্ব-অভিব্যক্তির পক্ষে যথেষ্টই। সেই ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে স্টেট্ আমাকে ডিক্টেট্ করতে আসে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবিরা বলবেন, না আসুক, দেহ খাটালে আমাদের আত্ম খাটো হয়—এই হচ্ছে সাফ্ কথা। তাঁরা শাস্ত্রপুঁথি খুলে তত্ত্বকথা আওড়ান্; আমরা ভাবি, এমনিই বুঝি। কিন্তু হায়, দৈনিক ছ'ঘণ্টা ক'রে আমরা ঘুমোই এবং সেটা দৈহিক নিদ্রা—কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের বা চিত্তের বিকাশ রুদ্ধ হয় না। কেবল দৈহিক শ্রম করলেই আত্মার মাথা কাটা যায়!

এবার বিচিত্রার পাতায় আসা যাক: এখানে সোস্যা-লিজ্‌মের যে-খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়েচে তাও কম বিচিত্র নয়! শ্রীযুত শচীন সেন যে such insane হতে পারেন, এই প্রবন্ধটি পড়ার আগে তা বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। এমন পাকা রকমের কাঁচা লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। এত উল্টো-পাল্টা কথা এর মধ্যে যে, জবাব দেব কি, তা জীর্ণ করাই কঠিন। বকুনি দেবার সুবিধা হবে ব'লে লেখক মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বুক্‌নি ঝেড়েচেন, কিন্তু তিনি এ-কথা ভুলে গেচেন যে, সম্প্রতি পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে-কটি মাথা, তাঁরা

সবাই সোস্যালিজ্ম্‌কে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই দলে নন্ এই দুষ্কল্পনা করে শচীনবাবু রবীন্দ্রনাথের অপমান করেছেন, এবং সম্ভবত নিজেরও সম্মান বাড়াননি।

শচীন বাবুর প্রবন্ধ থেকে পঙ্কোদ্ধার করা শক্ত ব্যাপার, সে-চেস্টা আমি করবো না। বিস্তর বাগ্‌বিস্তারের ভেতর থেকে তাঁর যে-তিনটি বক্তব্য আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি কেবল তারই জবাব দেব। শচীন বাবুর কাছে সব চেয়ে বড়ো 'সমস্যা' এই যে,

'সব ধর্মগ্রন্থ সোস্যালিজ্ম্ প্রচার করে না' এবং সব বড় লোক সোস্যালিষ্ট নয়।'

অতএব এই জন্যই এ-বস্তু অগ্রাহ্য, এই কথা তিনি বল্‌তে চেয়েছেন।

ধর্মগ্রন্থ কেন সাম্যবাদ প্রচার করে না—তার কারণ এই যে, সমাজের উচ্চস্তরের স্বার্থরক্ষার জন্যই ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি; কেবল নিজেই একাজে নিযুক্ত নয়, ভগবান, আত্মা, পরলোক, কর্মফল ইত্যাদি মামুলি তত্ত্বকেও বড়ো লোকদের স্বার্থ-সাধনের এই কাজে সে লাগিয়েচে। কয়েকজনের সুবিধার জন্য অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্যগণ্ডা থেকে বঞ্চিত থাকবার প্রেরণা পাবে, যে-শাস্ত্র এমন প্রোপাগাণ্ডা করতে পারে তারই নাম ধর্মগ্রন্থ। বস্তুত বলতে গেলে, ধর্মগ্রন্থও এক প্রকার ক্যাপিটাল, এ-কে খাটিয়ে খাওয়া চলে, ভাঙিয়েও কিছুদিন

বেশ যায়,—কিন্তু মেরে খাওয়া চলে না। আর মহাপুরুষরা যে সোশ্যালিস্ট্ নন্, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এ পথ তত করতালিমুখর নয়। কেবল দিতে জানলেই সোশ্যালিষ্ট্ হয় না, নিতে জানাও চাই। মানুষের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেই মহাপুরুষ হওয়া যায়, কিন্তু সোশ্যালিস্ট্ হতে হলে তার চেয়ে শক্ত স্টাফ্ দরকার। দরিদ্রকে যে নারায়ণ বলে সেই মহাপুরুষ, কিন্তু তার এই নারায়ণত্ব থেকে যে তাকে চিরবঞ্চিত করে সে-ই হচ্ছে সোশ্যালিষ্ট্।

শচীনবাবুর দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য হচ্ছে অর্থনীতিক। তিনি অনেক আগড়ম্ বাগড়ম্ বলেচেন, তার প্রতিকথা বাদ দিয়ে প্রতিবাদ্য এই কথা পাওয়া গেল—'কাঞ্চন-বণ্টনের চেয়ে কাঞ্চন বাড়ানো ঢের শ্রেয়।' শচীনবাবুর মন অর্থনীতির পুরাণো সূত্রে আবদ্ধ, আধুনিক কালে এক্ষেত্রে যে-নূতন সূত্রপাত হয়েচে তাকে আমল দিতে তিনি রাজি নন্। আধুনিক তথ্য এই যে, বণ্টন করেই প্রকৃতপক্ষে বাড়ানো যায়—তাতে হয় কাঞ্চনের প্রসার, তা ছাড়া অন্য ভাবে বাড়াতে গেলে যা হয় তাকে বলে পুঁজি, তারই নাম প্রপার্টি; জনকতকের প্রপার্টির সঙ্গে বাদ বাকি সকলের পভার্টি বেড়েই চলে—এর দু'টোই হচ্ছে ক্রাইম্। এই ক্রাইম্ দূর করতে চায় সোশ্যালিস্ট্, কেবল দরিদ্রকে raise করেই নয়, ধনীদের erase ক'রে।

ধর্মনীতি গেল, অর্থনীতি গেল, এখন রইল শচীনবাবুর তিন নম্বর আপত্তি। তা হচ্চে, কমিউনিষ্টদের কর্মনীতি নিয়ে। তারা ধীরে-সুস্থে কিছু করতে চায় না, তারা র‍্যাডিক্যাল্, ইভোলিউশনের চাকার দুর-বিপাক দুর ক'রে ক্ষিপ্রপাক দিলে যা হয় সেই-রিভোলিউশনের তারা পক্ষপাতী। আসলে, যারা নতুন পথ কাটে তারাই র‍্যাডিক্যাল্,—তাদের হচ্চে নির্বিচার। পথের বাধা তাদের কেটে সাফ করতে হয়, ছোটো খাটো কাঁটা-গাছ যেমন কাটা ওড়ে, বড়ো বড়ো মহীরুহেরও সেই এক গতি। কেউ হয়ত বলবেন, এসব বনস্পতি বহুকালের, এরা সনাতন, অনেককে ছায়া দিয়েচে ঠাঁই দিয়েচে; কিন্তু তার মায়া করলে চলে না। কেননা, মানুষ-যে অচল হোলো তার পথ চাই আগে।

একদল যখন পথ কাটে আর একদল দেয় বাধা, তখনি বাধে লড়াই। তারই নাম ক্লাস্ওয়ার্—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যতদিন পথ শেষ না হয় ততদিন লড়াই শেষ হয় না। কিন্তু পথের বিপক্ষে যারা, তাদের হটতে হবেই—চিরদিনই হটতে হয়েচে; তারপর সেই পথ প্রশস্ত হলে যারা সেই পথে চলবে তারা শ্রেণীযুদ্ধ ক'রে চলবে না, চলবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। এর প্রশস্তিই আজকের লেনিনের মুখে যুদ্ধের শ্লোগান্, সে হাঁকচে—Turn to the Right and attack। কিন্তু

কালকের লেনিনের মুখে শুধুই প্রেমের গান! তাকে লেনিন ব'লে চেনাই যায় না!

শচীন বাবুর প্রবন্ধের আশ্চর্যলোকে একটি চমৎকার বাক্য পেলাম, তিনি বলেচেন

'মানব-জাতির ওপর শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এই বিরাট মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে মানবজাতির ওপর।'

তিনি দু'চারজন সুপারম্যানের ওপর সব মানুষের ভবিষ্যতের বোঝা চাপাতে চান। বোঝা গেল, মানবজাতি বলতে তিনি দু'চারজন ভাগ্যবান মানুষকে বোঝেন; মানব জাতির ওপব তাঁর এই অসাধারণ শ্রদ্ধার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ!

মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা আমারো আছে, কিন্তু আমি মনে করি, মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে মানবজাতিরই ওপর। সুপারম্যান্ হচ্চে সমস্ত মানুষেব সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তাব অবনতির মূর্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক, আর অস্ত্রশস্ত্রের বলেই হোক, সমস্ত মানুষকে নিল্‌ডাউন্ ক'রে রেখে নিজের উচ্চতা-প্রদর্শনের প্রয়োগনৈপুণ্য যাদের তারাই সুপারম্যান্। কিন্তু মানুষের এই স্পেসিস্-এর .লোপ আসন্ন হয়ে এসেচে, শীঘ্রই এরা মিসিং-লিংক্-এ পরিণত হবে। সমস্ত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ালে কারু মাথা কারুকে ছাড়িয়ে

ওঠে না। সোশ্যালিজ্‌ম্‌ চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে... সুপারম্যানের এক্‌জিবিশন্‌ খুলতে নয়।

সব শেষে মহেন্দ্র বাবুর একটি কথা নিয়ে আলোচনা করবো। তিনি বলেচেন, 'বলশেভিক গণমানবের জীবনে কোনো পরমনীতি নাই।'

অপরকে শোষণ ক'রে কী ভাবে নিজেকে পোষণ করা যায় তারই উপায় বাৎলে দেয় অর্থনীতি এবং এই তুষ্কর্মের চক্ষুলজ্জা থেকে যা বাঁচায় তারই নাম ধর্মনীতি কাজেই মহেন্দ্র বাবুব স'গোত্রদের পেটেণ্ট-করা 'পরমনীতি', 'পরম উদ্দেশ্য' এবং 'সনাতন পরিণতি'র প্রতি এতদিনের প্রতারিত ও 'পরিণত' গণমানবের যদি কিছুমাত্র আস্থা ও উৎসাহ না থেকে থাকে তাতে তাদের দোষ দিতে পারিনে। যে-পরমনীতি এতদিন তাদের দাবিয়ে এসেচে আজ মাথা তুলে তাকেই দাবানো যদি তাদের প্রথম নীতি হয় আমি আশ্চর্য হবো না। কেননা নীতির চেয়ে মানুষ বড়ো। মানুষই নীতি গড়ে, নীতির মানুষ গড়বার সাধ্য নেই; এবং নীতি ভাঙ্‌তে পারে ব'লেই মানুষ মানুষ।

তবু কমিউনিষ্টদের জীবনে 'পরম না হোক্‌, চরম নীতি একটা আছে, তা হচ্চে All for one and one for all; প্রত্যেককে পূর্ণ ক'বে প্রত্যেকের সম্পূর্ণতা। এই নীতি তারা কোনো পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ ক'রেই রাখে

নি, তাদের জীবনে একে রচনা করেচে। পুঁথি প'ড়ে বা পুঁথিপড়া বিদ্যায় কমিউনিজম্‌কে বোঝা শক্ত, বই প'ড়ে তার অতীতের ইতিহাস পেতে পারি, কিন্তু তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা জানতে পারিনে। কেননা এ হচ্চে জীবনের প্রকাশ —বনস্পতির মতোই অফুরন্ত-প্রাণ; এর মধ্যে সনাতন কিছু নেই, কিম্বা থাকলেও তা বড়ো হয়ে—তাই একমাত্র হয়ে নেই। এ প্রত্যহের, প্রতি মুহূর্তের; এ বেড়ে চলেচে; বিচিত্র ফলে এর বীজ, বিবিধ ক্ষেত্রে এর অঙ্কুরতা, বিচিত্র অঙ্কুরে এর পাদপত্ব—বিচিত্র পাদপে সাফল্য।

মানুষের সভ্যতার এতদিনের ইতিহাসে আমরা দেখি দু'দল মানুষ। এক দল অখণ্ড স্বার্থপরতায় ঘোষণা ক'রে বলেচে—পৃথিবীর সবাই আমার জন্য। স্টেট—সে তো আমি! আমি চরিতার্থ হবো—সেই তো এই পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো কথা। আরেক দল এদের প্রায়শ্চিত্ত করেচে বনবাসে অথবা ক্রুশকাঠে; তারা বলেচে, আমি এসেচি পৃথিবীর সকলের জন্যে; সকলের কাছে আমি নিজেকে দিয়ে গেলাম।—এদের দু'দলই সভ্যতার অসম্পূর্ণতার পরিচয় দেয়।

কেবল দেশে মহাদেশে নয়, ছোটো ছোটো গ্রামে ছোটো খাটো গোষ্ঠীর মধ্যেও এই দু'দল লোক আজ পর্যন্ত বর্তমান —একদলের নিষ্ঠুর লোভ আরেকদলের নির্বিচার ত্যাগ। বুদ্ধ ও যীশু চলে গেছেন, এক আধজন নয়, লক্ষ লক্ষ বুদ্ধ ও যীশু

আত্মদান করেচেন—তার ইতিহাস রচিত হয়নি ; কিন্তু মানুষের সভ্যতা অসম্পূর্ণ রয়েচে আজো।

এই সভ্যতাকে সম্পূর্ণ করতে এসেছে কমিউনিজম্ এর চিরন্তন দ্বন্দ্ব এ মিটিয়েচে। একরোখা সভ্যতাকে এ দো-রোখা করেচে, এর মধ্যে এনেচে সামঞ্জস্য ও শ্রী। কম্যুনিষ্ট বলে না যে, আমি সবার জন্যে, কিম্বা আমার জন্যে সবাই ; তার বার্তা হচ্চে, আমি যেমন সবার জন্যে তেমনি আমার জন্যে সবাই। এই কমিউনিজ্মের মূলনীতি। মানুষকে এ মুক্তি দিয়েচে নিরর্থ সঞ্চয় থেকে ও নিষ্ফল আত্মদান থেকে। স্বার্থত্যাগের বাণী এর নয়, এ বলেচে স্বার্থ-যোগ করতে, একের স্বার্থের সঙ্গে সকলের স্বার্থের। অবশ্য কতকগুলো মানুষের বুদ্ধ বা যীশুর মতো মহাপুরুষ হবার পথে এ কাটা দিয়েচে। স্বার্থকে মহত্ত্ব দান করেচে এ। আমি দিচ্চি অথচ আমিই ফিরে পাচ্চি! এ যেন সমস্ত মানুষের প্রতি সমস্ত মানুষের চুম্বনদান—প্রদানের সাথেই আদান—দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে পাওয়া এখানে—নিজের চুমু-কেই ফিরিয়ে পাওয়া যেন—প্রত্যেক চুমুকে।

ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্ততা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় দ্বিতীয় পর্বে (১) এসেচেন, কিন্তু সেটা তাঁর শান্তিপর্ব নয়। বলশেভিক গণমানবদের 'ব্যাভারে' তিনি যেরূপ অশান্তি ভোগ করছেন তাতে তাদের পার্বণে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে যাঁরা যোগ দিয়েচেন, তাঁদের ওপরে চটে-মটে এই রায় তিনি দিয়েচেন, যে, 'সহজ মনোবৃত্তির বশে সাময়িক ভাবের বন্যায় গা ভাসিয়েচেন তাঁরা।'

মহেন্দ্র বাবুর যদি যোগ দেবার ক্ষমতা না থাকে তবে বলবো সেটা তাঁর গুণ ; কিন্তু সহজ মনোবৃত্তির তাঁর যে-ধারণা তা ঠিক নয়। সভ্যতার ইতিহাসে যখনি কোনো নতুন পথের আবিষ্কার হয়েচে তখন অল্প কয়েকজনই সে-পথে পা বাড়িয়েচে, তারাই শুধু বলেচে এই পথেই রয়েছে বহু দূর-গতি ; কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল পা গুটিয়েই বসেনি, পিছন ফিরে বসেচে। মহেন্দ্রবাবুদের মতো তাদেরো কোলাহল এই ছিল যে, এর পরিণামে দূর-গতি নয়, দুর্গতি। এবং তাই হচ্চে সহজ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

বহুদিনের ও বহুজনের অন্তর্গূঢ় তাপে ও সন্তাপে অচল হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে, সাম্যবাদের যে ক্ষীণ ধারাটি খুব সম্প্রতি এই দেশের বুকে নেমে এসেচে তাকে বন্যা বলা

(১) বলশেভিক গণমানব, ২য় পর্ব,— নবশক্তি, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

চলে না কিছুতেই ; এবং তার নিঃশব্দ আবেদনে সাড়া দিয়েচে যত জনা, তাকে সশব্দ আলোড়নে তাড়া করেচে তার ঢের বেশি।

কিন্তু তবু একদিন এ বন্যার আকার ধারণ করবেই। কেন ? তার কারণ মহেন্দ্র বাবু যদি ভেবে না পেয়ে থাকেন, যিনি ভেবে পেয়েচেন তাঁর কথাতেই বলি ঃ (১)

"মানুষের একলা হবার প্রবৃত্তিই হচ্চে তার রিপু, সত্যভাবে মিলিত হবার সাধনাই কল্যাণ। এই দুই-এর বিরোধ নিয়ে কুরুক্ষেত্র লড়াই মানুষের ইতিহাসে চলে আসচে। এখনো মানুষ শান্তি-পর্বে এসে পৌঁছয়নি।

"সংহতির মূল প্রবর্তনার ভিন্নতা অনুসারে তার প্রকাশের ভিন্নতা ঘটে, এই মূল প্রবর্তনা যদি রাষ্ট্রিকতা (politics) হয়, পররাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় স্বরাষ্ট্রকে শক্তিমান ও সম্পৎশালী ক'রে তোলবার চেষ্টা হয়, তবে তার দ্বারা যে-সংহতি ঘটে সে হয় অহমিকার সংহতি, তার বাহ্যরূপে একটা মিলনের চেহারা দেখা যায় কিন্তু তার মূল তত্ত্ব মিলন-তত্ত্ব নয়, প্রধানত সে হচ্চে দ্বন্দ্ব। সেই বিরাট অহমিকার মেদস্ফীত আত্মম্ভরিতাকে অস্ত্রেশস্ত্রে রত্নালঙ্কারে ভূষিত দেখে লুব্ধ মানুষ তার পূজায় প্রবৃত্ত হয়। এই পূজার প্রধান আয়োজন নরবলি।

"সেই বলির মানুষ যে কেবলমাত্র পররাষ্ট্রের মানুষ তা' নয়। আপন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে

(১) "সংহতি" কাগজে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কমিউনিজম্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

ফেলে খর্ব না করলে এই রাষ্ট্রীকতার পুষ্টি হয় না। তার শক্তি-মূর্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেটে ছেঁটে জুড়ে তেড়ে সৈনিকরূপে নিজের জয়রথ তৈরি করে, যে পর্যন্ত-না এই রথে করেই তার শ্মশানযাত্রা ঘটে। তার ধনমূর্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু ক'রে তাদের পিণ্ড পাকিয়ে নিজের জয়স্তম্ভকে অভ্রভেদী ক'রে তুলতে থাকে, যে পর্যন্ত-না এই স্তম্ভ বিদীর্ণ ক'রে নৃসিংহ বেরিয়ে আসে।

"মানুষের ইতিহাসে এর আগে অনেক দুঃখ দুর্ঘটনা ঘটেচে। শক্তির লোভ ধনের লোভ চিরদিনই নররক্ত-পিপাসার পরিচয় দেয়। তার স্বর্ণলঙ্কায় চিরদিনই দেবতাদের হাতে হাতকড়ি পড়েচে। তার দশমুণ্ড বিশ হাত দশ দিকে ধর্মকে উপেক্ষা করবার জন্য উদ্যত। তাই চিরদিনই তার স্বর্ণলঙ্কায় কোনো-না-কোনো সময়ে আগুনও লেগেচে।

"কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় এই রিপু যে রকম কঠিন উপকরণে বিরাট আকারে আপনার গড় বেঁধেচে এমন কোনোদিন করেনি। এর তাড়কারাক্ষসীর দল জগৎসুদ্ধ লোককে তাড়না ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তুলল! অবশেষে আজ এই সংহতির চেলাদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে বলচে "শান্তি চাই, শান্তি চাই।" কেন-না এবারকার লঙ্কাকাণ্ড ত্রেতাযুগকে হারিয়ে দিয়েছে।

"কিন্তু রিপুও পুষব শান্তিও পাব—বিধাতার সঙ্গে এমনতরো

চাতুরী ত চলে না। চোরাই মালে ঘর বোঝাই ক'রে বিচারকের কাছে মাপ চাইব এমন দরবার ত মঞ্জুর হবে না। —আগুনের পর আগুন লাগবে, যুদ্ধের পর যুদ্ধ বাধবে।

"ইতিমধ্যে মানুষের ইতিহাসে অন্ধকার গুহার মধ্যে একটি উপেক্ষিত শক্তি গোপনে আপনার বেগ সঞ্চয় করছিল। পরোপজীবী হয়ে যে-ব্যবস্থা আপনাকে পোষণ করে, একদিন তার উপজীবিকাই তার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান যুগের সভ্যতার মতো এমন দাসতন্ত্র সভ্যতা আর নেই। এই সভ্যতা উপকরণ-বায়ুগ্রস্ত। এই উপকরণের অধিকাংশই তার পক্ষে বাহুল্য। অথচ একে তৈরি করতে, এর ভার বহন করতে, একে রক্ষা করতে বহু দাসের দরকার। তাদের না হ'লে এ সভ্যতার একদিনও চলে না। তার মানে হচ্ছে, এইখানেই এর সকলের চেয়ে দুর্বলতা। তার বিপুল ঐশ্বর্যের দ্বারাতেই এতদিন তার এই দুর্বলতা ঢাকা পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে এইটে প্রকাশ হয়ে পড়চে।

"যারা অত্যাবশ্যক তাদের আবশ্যকতাই তাদের ঐশ্বর্য। যতদিন এ কথা তারা না জানে ততদিন নিজের মূল্য বোঝে না বলেই তারা এত সস্তায় বিকিয়ে যায়। বর্বরের দেশে, শোনা যায়, গজদন্ত পুঁতির মালার দরে বিকিয়ে গেছে। যখন তারা বাজার-দরের খবর পেয়েচে তখনই দামও চড়ে গেছে, তেমনি একদিন ইউরোপের রাষ্ট্রীক প্রতাপ দাসের

কাঁধে চ'ড়ে জগৎ জয় ক'রে বেড়িয়েছে। দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক। অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেচে যে, তারা না চালালে উপরওয়ালারা অচল। তারা অত্যাবশ্যক, অতএব বর্তমানের ঐশ্বর্য তাদেরই হাতে। এই আবিষ্কারের জোরে বর্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধ-ঝাড়া দিতে আরম্ভ করেচে—আর উপরে যারা ব'সে আছে তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। শক্তির যে-উপলব্ধি উপরে চ'ড়ে বসেছিল সেই উপলব্ধিটা নীচে বাহনের মধ্যে প্রবেশ করেচে।

"এই বাহনদের সংহতিই-যে মানুষের সকল সংহতির চেয়ে বড় তা আমি মনে করিনে। কেননা এখানেও দ্বন্দ্বের প্রভাব। শক্তি উপরে বসেও নখদন্ত চালনা করে, নীচে নেমেও সে বৈষ্ণব হয়ে ওঠে না। আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এসিয়াবাসীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের যে অন্যায় বিরোধ দেখা যায়, তার মধ্যে কেবল-যে ধনীদের হাত আছে তা নয়, ধনের বাহনদের হাতও আছে।

"কিন্তু ইউরোপে কর্মজীবীদের যে দল বেঁধে উঠচে তার মধ্যে একটি বড় কথা আছে। সে হচ্ছে এই যে, এই দল নেশনের বেড়াকে একদিন সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে এমন আশা দেখা যাচ্চে। কারণ ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটা ধ'রে টান

দিতে হচ্চে সে দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গেছে, যারা টানচে তারা সকল দেশেরই মানুষ। এই দড়িটার ঐক্যেই তারা এক। তাই এই ঐক্যটাকে অবলম্বন করে'ই তারা সম্পূর্ণ আঁট বাঁধতে পারবে।

"যদি এই আঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হয় তাহলে পৃথিবীতে একদিন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। এই দুঃসহ শক্তির প্রলোভনই সোভিয়েট সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। তারা তাড়াতাড়িতে এইটেকে জাগ্রত করতে লোলুপ হয়ে উঠেছিল। এবং সকল লোলুপতারই যে লক্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তি—তা সেখানেও দেখা দিয়েছিল।

"যাই হোক, শক্তির লীলা সমাজের উপরের স্তরে আপনার ভাঙাগড়ার কাজ অনেকদিন ধ'রে ক'রে এসেচে। এই শক্তি এবার নীচের স্তরে আপনার কাজ করবে বলে উদ্যোগ করেচে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই স্তরে যখন তার আধিপত্য দেখা দেবে তখনই-যে মানুষের সকল পাপ মোচন হবে, আর শক্তি তার শৃঙ্খল-রচনার চিরকেলে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি মানুষের মুক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হবে—এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। তবে এই কথা সত্য যে, সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের প্রবল সংঘাতের দ্বারাতেই শক্তি সৃষ্টি-কার্যের প্রয়োজন সাধন করে—ভূমিকম্প-দৈত্যদের হাতুড়ি-পিটুনির চোটেই আজকের দিনের এই পৃথিবী তৈরী

হয়ে উঠেছে। সমাজের নীচের তলায় যে উপকরণ-ভাণ্ডারে এতদিন শক্তির কারখানাঘর বসেনি আজ সেখানে যদি বসে, তাহলে মানুষ তাতে ক'রে নিছক সুখ পাবে না, তাকে অনেক নতুন-নতুন ব্যথা সইতে হবে! সৃষ্টি-কার্যে এই ব্যথার দরকার আছে। অতএব তার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভালো।

"পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্চি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে বঞ্চিত হবে। নতুন শক্তির যে-বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরি হচ্চে তার একটা সিংহদ্বার-রচনার ভার ভারতকেও নিতে হবে বইকি!"

* * *

মহেন্দ্র বাবু কেবল যে ব্যক্তিতন্ত্র চান তাই নয়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও তিনি চান—এইজন্যই তিনি সাম্যবাদের বিরোধী। আসলে কিন্তু স্বাতন্ত্র্যই সব চেয়ে বড়ো জিনিষ নয়। একা থাকার মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু সার্থকতা তাতে নেই; সার্থকতা আছে সকলের সঙ্গে সমান লয়ে মিলতে পারাতে, বন্ধুর সঙ্গে হুবহু এক হয়ে যাওয়াতে। মেলবার আর মেলাবার এই কলাকৌশল যার জানা—এই-মিলনের রস যে পেয়েচে সে-ই এ তত্ত্ব জানে। চরিতার্থতা লাভ করতে হলে অপরের সঙ্গে মিলে তা লাভ করতে হবে, একার বাহাদুরিতে তা মেলে না; সকলে সম্পূর্ণ হলে তবেই আমি সম্পূর্ণ হতে পারি। কেউ যদি ধনের মানের আভিজাত্যের

তুঙ্গ শৃঙ্গে একক থাকতে চায়, তার শিং ভেঙ্গে তাকে জোর ক'রে মিলনের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনাটা তার প্রতি মোটেই জবরদস্তি নয়, বরং সেইটেই হবে জবররকমের দোস্তির পরিচয়।

মহেন্দ্রবাবুর মতে, 'ব্যক্তিত্বকে একাকারতার' মধ্যে বিনিঃশেষ করাই হচ্চে, সাম্যবাদের মূল প্রেরণা। তিনি বলচেন—'বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপনাকে বিকশিত করবার

> এই যে চেস্টা এ হচ্চে বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনা। এই ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করবার চেস্টা, ব্যক্তিধর্মকে অখণ্ড একাকারতার মধ্যে বিলীন করবার চেস্টা হচ্চে বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে চেষ্টা।'

প্রকাণ্ডতম আস্তিক হয়েও, মহেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস হোলো যে বিশ্বে বাস করেও, সাম্যবাদীরা, বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনাকে কেবল-যে অগ্রাহ্য করচে তাই নয়, তার বিরুদ্ধ চেষ্টা ক'রে তাকে বিধ্বস্ত ক'রেও তাদের বাড় বাড়চে। কিন্তু প্রচণ্ডতম নাস্তিকেরও এ কথা বিশ্বাস করতে ঈষৎ সঙ্কোচ হবে। আমি তো মনে করি, মহেন্দ্রবাবুর তথাকথিত বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনাকে পূর্ণ করার প্রেরণাই হচ্চে সাম্যবাদের। বহু প্রচ্ছন্ন ও আচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বকে বিচিত্র প্রকাশে সার্থক ক'রে তোলার জন্যই এর অভ্যুদয়। বিশ্বশক্তির মনোবৃত্তির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বা বিশ্বপ্রকৃতির মনস্তত্ত্বের খোঁজ-খবর রাখি এমন কাহিনী বলার স্পর্ধা আমার নেই, তবু বিশ্বজনীন

গতিবিধি দেখেই এই ধরণের বিজাতীয় একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনীভূত হয়েছে।

মহেন্দ্রবাবু যান্ত্রিকতার নিন্দা করেচেন, বলেচেন—বিজ্ঞানের কৃপায় যান্ত্রিকতার আবির্ভাব হয়েচে, আর এই যান্ত্রিকতাই ব্যক্তির মর্যাদাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করচে। তাঁর এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু এটা হয়েচে, তাঁর ব্যক্তিতন্ত্র আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে, যার পক্ষে তাঁর এতটা ওকালতি! সাম্যবাদের যুগে, এই যান্ত্রিকতাই মানুষকে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেবে, তার যন্ত্রণালাঘবের প্রধান সহায় হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিকতার সাহায্যে এ যুগের মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিন-চার ঘণ্টার বেশি খাটার প্রয়োজন হবে না, বাকি বিশ ঘণ্টা সে আপন চরিতার্থতার কথা ভাববে, ব্যক্তিত্বের সাধনা করবে। রুটির গরজে কয়েক ঘণ্টাই রোজ—বাকী সময়টা তার নওরোজ। যন্ত্রের ভিতরে কিছু শয়তান নেই, তা আছে যন্ত্রীর মনে। মারতে হলে হাতই চালাই, কিন্তু আলিঙ্গনে বাঁধতে হলেও সেই হাতই চালাতে হয়।

মহেন্দ্রবাবুর ধারণা, পৃথিবীতে যারা ব্যক্ত কেবল তারাই ব্যক্তি, আর যারা নয় তারা ব্যক্তি নয়, তারা Mass—গণমানব। অতএব গণমানবের কর্তব্য নয় এই মুষ্টিমেয় দুর্লভ ব্যক্তির মূল্যবান ব্যক্তিত্ব ফলানোতে বাধা দেওয়া। কিন্তু এই যে অসংখ্য মানবসমষ্টি—তাদেরো আত্ম-বিকাশের প্রয়োজন

আছে বা তারাও প্রত্যেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে পারে, এটা মহেন্দ্র বাবু কখনও মনে করেন না। মহেন্দ্রবাবুর মতে তথাকথিত ক্ষণ-জন্মা ব্যক্তিরা চিরজন্ম এদের, এই মুখাপেক্ষী গণমানবের, 'ভাগ্য নির্ণয়' ক'রে দেবেন; ব্যক্তিহিসেবে নিজের 'পথ-নির্বাচন' করবার শক্তি হতভাগ্য এদের কোনোদিন হবে না, কেননা তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ভুলে যাচ্চেন কয়েকজন মানুষ আর-সবাইকে চালাবে এইটাই অস্বাভাবিক, এ হচ্চে সভ্যতার অপরিণত অবস্থার লক্ষণ; সমাজের পারফেক্ট অবস্থায় এ ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব নয়। চিরদিন যা চ'লে এসেচে তাই যে চিরদিনই চলবে এমন কিছু কথা নেই।

তার পরের কথা, ব্যক্তিত্ব-বস্তুটা আসলে কী?

অনন্তের সঙ্গে রহস্যময় সংযোগ ঘটলে মানুষ আপনার অন্তর্লোক থেকে আপনি উন্মোচিত হতে থাকে, তাই হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। অনন্তের পরিচয়ে মানুষ আপনার পরিচয় পায়, আপনাকে জানে; নিজেকে প্রকাশ করবার আশ্চর্য কৌশলও সেখান থেকেই সে আয়ত্ব করে। মানুষকে যদি তার দারিদ্র্য থেকে, তার অজ্ঞানতা থেকে, তার তুচ্ছতা ও তার প্রত্যহের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে পারি তাহলে তাদের প্রত্যেকে অতি সহজেই আপনাকে প্রকাশ করবার স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রেরণা পাবে। অনন্তের সঙ্গে সংযোগ সব চেয়ে সহজ হয়ে ওঠে যদি সেই মিলনের বাধাগুলো সব

আগে দূর হয়,—তখন অনন্তের সহিত সাম্যযোগে প্রত্যেক মানুষই বিরাট, বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ; এবং প্রত্যেকের সমান। অনন্ত কতিপয় ব্যক্তি-বিশেষের এজমালি সম্পত্তি নয়, তার অক্ষয় ভাণ্ডারে প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার; সাম্যবাদ মানুষকে আত্মার সেই ঐশ্বর্যলোকে নিয়ে যেতে চায়। এখন রবীন্দ্রনাথের মতো এক-আধ জন মানুষের মধ্যে সৃজনী-শক্তির যে অপূর্ব লীলা দেখে আমরা মুহ্যমান, সেই পরমা সৃজনী-শক্তি (creative force) তখন সমস্ত মানুষের মধ্যে মুক্ত হবে। তার ফলে মানুষের সভ্যতা সে-দিন যে কী রূপ, কী গতি ও কী বিপুল সার্থকতা লাভ করবে তা আজ কল্পনা করবারও কারু ক্ষমতা নেই। অতঃপর এই কথা মহেন্দ্রবাবু দয়া ক'রে মনে রাখবেন যে, প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তি হতে পারে, যদি তারা ব্যক্ত হতে পারে। এবং এই ব্যক্ত হওয়ার পথেই সাম্যবাদ মানুষকে নিয়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান

—"সুপারম্যান হচ্ছে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তার অবনতির মূর্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক, আর অস্ত্রশস্ত্রের বলেই হোক্, সমস্ত মানুষকে নিল্‌ডাউন ক'রে রেখে নিজের উচ্চতা প্রদর্শনের প্রয়োগনৈপুণ্য যাদের তারাই হচ্ছে সুপারম্যান। কিন্তু মানুষের এই স্পেসিস্‌-এর লোপ আসন্ন হয়ে এসেছে, শীঘ্রই এরা মিসিং-লিংক-এ পরিণত হবে। সমস্ত মানুষ সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে কারু মাথা কাউকে ছাড়িয়ে ওঠে না। সোস্যালিজম্‌ চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে—সুপারম্যানের একজিবিশন্‌ খুলতে নয়।"

এই কথাগুলি আমার। পূর্বলিখিত দো-রোখা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় গত ১৩৩৬ অগ্রাণের প্রবাসীতে 'কাবুলিওয়ালা' নামক এক প্রবন্ধে আমার এই কথাগুলির প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেচেন।

সুরেশ বাবু তাঁর প্রবন্ধের গোড়াতেই "বড়বাজারের কাবুলিওয়ালা আর বোলপুরের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য" আবিষ্কার করেচেন ;—তা এই যে, "রবীন্দ্রনাথের কাছে 'আত্মানং বিদ্ধি'র বাণী সত্য, অপর পক্ষে কাবুলিওয়ালার কাছে ওর কোনো মানেই হয় না।" সুরেশ বাবুর "দিব্যানুভূতি" বিস্ময়কর, কিন্তু তিনি যত মস্ত মনে করেচেন পার্থক্যটা তত বড়ো নয়—আসলে পার্থক্যটা হচ্ছে এক

সম্পূর্ণ ও এক অসম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে। কাবুলিওয়ালার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নেই বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কাবুলিওয়ালা অবশ্যই আছে—কেননা সম্পূর্ণ হতে হলে অপূর্ণতার সব ধাপগুলিই পেরিয়ে আসতে হয়, একলাফে তা এড়িয়ে আসার যো নেই। একজন সম্পূর্ণ মানুষের, চেতনাতেই হোক্ আর অবচেতনাতেই হোক্ কাবুলিওয়ালা যেমন আছে তেমনি আদিম বর্বরেরও আসন রয়েছে। সুতরাং কাবুলিওয়ালাকে তিনি যে উপহাস করেচেন তার অনেকখানিই গিয়ে লেগেচে তাঁর তথাকথিত অসাধারণ মানুষদের গায়ে।

বিচার ক'রে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাবুলি-ওয়ালার তফাৎ কোনখানে? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি কাবুলি-ওয়ালা নেই? তিনি কি জমিদারি চালান না? প্রজাশোষণ করেন না? ব্যবসাবুদ্ধিতে তিনি কি কোনো কাবুলিওয়ালার চাইতে কম? তফাৎ শুধু এই, বেচারা কাবুলিওয়ালা শুধুই কাবুলিওয়ালা; অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালা প্লাস 'আত্মানং বিদ্ধি' প্লাস আরো অনেক কিছু। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ হবার সুযোগ পেয়েচেন, প্রেরণা পেয়েচেন ও সম্পূর্ণ হয়েচেন; কাবুলিওয়ালা তা পায়নি, তা হতে পারেনি। কিন্তু কাবুলি-ওয়ালার মধ্যেও-যে সম্পূর্ণ মানুষের সম্ভাবনা নিহিত আছে এ কথা কে অস্বীকার করবে? দু'শো বছর আগে বাংলার জমিদারেরা ডাকাতি করতো, তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা

যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কাবুলিওয়ালাই-বা এমন কী অপরাধ করলো যে তার বেলা বিশ্ববিধানের অন্যথা ঘটবে? তবে সুরেশ বাবু যদি মনে ক'রে থাকেন যে, দু'চার জন সুপারম্যানের চাকচিক্য দেখাবার জন্যে, বিশেষ ক'রে সুপার-তাত্ত্বিকদের উপমার খোরাক যোগাবার খাতিরে কাবুলিওয়ালাদের চিরদিন 'কাবুলিওয়ালা হয়েই' থাকতে হবে, তবে সে কথা আলাদা!

সবাই সুপারম্যান হবে—এ কথা সুরেশ বাবু বলেন না, কেননা তাহলে সুপারম্যান কথাটির অনর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু সকলেই সম্পূর্ণ হতে পারে একথা আমি বলি। একজনের ধনী হতে হলে অনেককে দরিদ্র হতে হয় এবং নিজের বিভব বজায় রাখতে দরিদ্রদের দরিদ্র ক'রে রাখাই ধনীর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি সুপারম্যানকে অনেক খর্ব মানুষের অপেক্ষা রাখতে হয়, তা নইলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটে না। তাদের খর্ব রেখেই তাঁর গর্ব, তাঁর জৌলুষ, তাঁর জেল্লা—যেমন

(১) সুরেশ বাবু তাঁর প্রবন্ধে বার বার রবীন্দ্রনাথকে টেনেচেন, এই হেতু প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-আলোচনা বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হোলো তার জন্য আমি খুসি নই। প্রবন্ধ-লেখকেরা নিরুপায়, কেবল মধু-পরিবেশনের ভাগ্য তাদের নয়। সত্যের উন্মোচনের জন্য তারা দায়ী, এই কারণে যা সত্য ব'লে মনে করে অপ্রিয় হলেও তা প্রকাশ না ক'রে তাদের উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার যে-একান্ত শ্রদ্ধা তা তিনি তথাকথিত সুপারম্যান ব'লে নয়, সম্পূর্ণ মানুষ বলে'। আমি তাঁকে এ যুগের সম্পূর্ণতম মানুষ ব'লে মনে করি। যিনি সম্পূর্ণ তিনি তাঁর সোনায় আর খাদে সমস্তকে নিয়ে সম্পূর্ণ; সম্পূর্ণভাবে তাঁকে দেখাই তাঁকে সত্য ক'রে দেখা, তাঁকে খাটো ক'রে দেখা নয়।

ইটালির বর্তমান সুপারম্যান। জায়েণ্টের দেশে গিয়ে গালিভারের সুবিধা হয় নি, বামনের দেশে এসেই সে জেনেছিল এবং জানাতে পেরেছিল যে সে সুপারম্যান।

কিন্তু মানুষ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তার এ রীতি নয়। নিজে সম্পূর্ণ হতে হলে অপরকে অসম্পূর্ণ করতে হয় না, কেননা অপরকে অপূর্ণ রেখে নিজে পরিপূর্ণ হওয়া যায় না। একজন সম্পূর্ণ হলে তার সংস্পর্শে এসে অপর সকলে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবেই—যেমন এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপে আলো জ্বলে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সম্পূর্ণ—যেমন তাঁর কাব্যে, সেখানে তিনি অসংখ্যকে পূর্ণতার প্রেরণা দিয়েচেন, দিচ্ছেন; সেখানে তাঁর দান অফুরন্ত—তা যেমন অগোচর তেমনি অচিন্ত্যনীয়; কিন্তু যেখানে তিনি সুপার—যেমন বোলপুরে, সেখানে সবাইকে অবোলা রেখেই তাঁর বোল-বোলাও! আশপাশের সকলে খর্বিত হয়ে আছে বলেই তিনি সুপার;—সেখানে তাঁর 'আত্মানং বিদ্ধি' আর সকলের আত্মাকে এমন ভাবে বিদ্ধ করেছে যে, তাঁর বনস্পতিত্বের আওতায় তাদের বৃদ্ধি কেবল অসম্ভব নয়, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েচে। সুপারম্যানের আত্মা যে-ক্ষেত্রে সর্বনাশ আনে, কাবুলিওয়ালা তত উঁচুতে নাগাল পায় না, পাত্তাও পায় না। কাবুলিওয়ালা বড় জোর থলি ধ'রে টানে, কিন্তু সুপারম্যান টানে কান,—তার ফলে কেবল কানই যে বড়ো হয়ে ওঠে তাই নয়, মাথাও মারা পড়ে।

সুপারম্যান ষ্ট্যাণ্ডস্ ফর্ হুম্? আমি যদি বলি—ফর নান্ বাট হিমসেল্ফ্, তাহলে সুরেশ বাবু মসী নিয়ে তাড়া ক'রে আসবেন এবং অনেক বুলি অনেক বচন আওড়াবেন; সত্য যেন বাসের মাগ্না আরোহী, অত্যন্ত কলরব শুনলে একান্ত সঙ্কোচে স্থান ছেড়ে দেয়! শুনতে পাই সুপারম্যানেরা লোকগুরু, তাঁরা বিশ্বমানবকে উদ্ধার করতে আসেন; যদি তাই এসে থাকেন তাহলে তাঁদের কাছাকাছি যাঁরা থাকেন সেই শিষ্য-সামন্তকে তো তাঁরা অতি সহজেই এবং অনেক আগেই উদ্ধার করতে পারেন। উদ্ধার অবিশ্যি শিষ্যরা হন; কিন্তু গুরু যে-নৌকোয় পার হন সে-নৌকো তাঁদের জোটে না, সুপারত্ব তাঁরা পান না, ডুবে পার হতে হয় তাঁদের। কিন্তু তবু তাঁদের আহ্লাদের সীমা নেই, কচায়নের অন্ত হয় না। অপরিসীম এই গর্ব তাঁদের যে—গুরুর তাঁরা শিষ্য! কিন্তু হায়, গুরুর তাঁরা ততটা প্রিয়জন নন্ যতটা প্রয়োজন। [শস্যকে আত্মসাৎ ক'রে গরুর যেমন আত্মনাং বিদ্ধি এবং আত্মার শ্রীবৃদ্ধি, শিষ্যের সঙ্গে গুরুরও সেই সুচতুর কায়েমী সম্পর্ক। অভিধানে গো শব্দে নানার্থ, তার এক অর্থ হচ্ছে—সুপারম্যান।]

প্রশ্ন এই, গুরু জাতীয় অতি-মানুষেরা সাধারণ মানুষের কী প্রয়োজনে আসেন, কোন দায় থেকে বাঁচান? যে-মানুষ পায় সে নিজের কাছেই পায়, গুরুর কৃপায় নয়। যে নিজের কাছ থেকে পাবার কৌশল জানেনি সমস্ত পৃথিবী তার প্রতি

কৃপণ। বুদ্ধ এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি কজনকে দিয়ে যেতে পেরেচেন ? মুসোলিনী চলে যাবেন, কিন্তু ইটালির সমস্ত ব্ল্যাক-শার্টদের মধ্যে তাঁর মুষল ধরার মুরোদ থাকবে কার ? ভাগ্যিস গুরুবংশে গুরুতর কিছু জন্মায় না, হয় তা লোপ পায় নয়তো কল্কি হয়ে দাঁড়ায় ; কিন্তু দৈবক্রমে গুরুরা যদি ধরাপৃষ্ঠে ধারাবাহিক বংশরক্ষা করতে পারতেন—পেতেন সে সুযোগ—তাহলে সেই বংশদণ্ডের মারে আর্ত মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তো।

সুরেশ বাবু পাতা ও ফুলের একটা উপমা দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েচেন যে, ফুলকে ফুটিয়ে তোলা যেমন পাতার নিজের গরজ তেমনি সাধারণ লোকের কাজ হচ্ছে অসাধারণদের মাথায় তুলে নাচা। কেননা সুপারম্যানকে,

> "তারা ব্যর্থ করতে পারে একমাত্র নিজের মৃত্যুকে অঙ্গীকার ক'রে।"

কেননা

> "বিশ্বমানবের যে সাধনা সে-সাধনার সিদ্ধির অভিজ্ঞান কাবুলের সহস্র সহস্র কাবুলিওয়ালা নয়—সে সিদ্ধির অভিজ্ঞান হচ্ছে দু'একটি রবীন্দ্রনাথ। ফুলগাছের ফুল যেমন একটা পরম সত্য, অসংখ্য সাধারণের মাঝে মুষ্টিমেয় অসাধারণ তেমনি বিশ্বমানবের একটা পরম সত্য।"

—কিন্তু পরম মিথ্যা যা, উপমার চুমা দিলেই তা কিছু

সত্য হয়ে ওঠে না—বৃক্ষ জাতি আর মনুষ্য জাতির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, তা এই যে বৃক্ষেরা এখনো মানুষ হয়ে ওঠেনি। এই কারণে তাদের মাঝে যা সত্য মানুষের মাঝে তা সত্য নাও হতে পারে। এই হেতু, পাতার সার্থকতা যদি-বা ফুলেই, অসাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের সার্থকতাও নেই সান্ত্বনাও নেই! তা ছাড়া মানুষের মধ্যে কারাই-বা ফুল কারাই-বা পাতা, আর তা বাছাই হবে কি ক'রে এবং ক'রবেই বা কে—এবং সেই বিচারের মধ্যে সত্য থাকবে কতটুকু? কেননা আজ যাকে মানুষের মধ্যে পাতা বিবেচনা করি কাল দেখি সে-ই ফুল হয়ে ফুটেচে।

তাছাড়া আরেক কথা। মানুষের মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ হয়েছেন তাঁরা নিজের সাধনার বলেই হয়েছেন, অন্যের সাধনার ফলে হননি। নিজেকে সম্পূর্ণ করাতেই ব্যক্তির আত্মসিদ্ধি—মানুষ শুধু আপনাকেই সম্পূর্ণ করতে পারে। অপরকে খানিকটা ব্যর্থ করতে সে পারে হয়ত, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ করা তার আয়ত্তের বাইরে। সে বড়ো জোর সম্পূর্ণ হবার প্রেরণা দিতে পারে কেবল, সম্পূর্ণ করতে পারে না। বিশ্বশুদ্ধ মানুষ সাধনা ক'রে মোলো আর তার ফলে "সিদ্ধির অভিজ্ঞানস্বরূপ দু-একটি রবীন্দ্রনাথ" জন্মালেন, এতে রবীন্দ্রনাথের আত্মসাধনার যেমন সম্মান দিই না, বিশ্বমানবের

সাধনারও (যদি বিশ্বমানবের সমষ্টিগত সাধনা ব'লে কিছু থাকে) তেমনি অপমান করি।

সুরেশ বাবু বলেন,

"মানুষের শক্তি আনন্দের কোন্ পৈঠা পর্যন্ত উঠেছে এই মুষ্টিমেয় অসাধারণ কয়জন তারই নিদর্শন"।

—বেশ ভালো কথা; আমি শুধু এই জিজ্ঞেসা করি. এই মুষ্টিমেয় অসাধারণের 'কষ্টস্বীকার' ক'রে আসার ফলে সর্বসাধারণও কি আনন্দের উচ্চতর পৈঠায় উত্তীর্ণ হয়, এবং এমনি ক'রে এক সুপারম্যানের শ্রীচরণ থেকে পরবর্তী সুপারম্যানের শ্রীচরণে কিক্‌ড্ হতে হতে ক্রমশ সুপারম্যানত্বের গোলে গিয়ে পৌঁছায়?

সুরেশ বাবু বলতে চান, হ্যাঁ। কেননা মানুষ "চির-অসম্পূর্ণ" —সে কখনই সম্পূর্ণ হবে না, কেবল সুপার হতে সুপারতর হয়ে চলবে। "মানুষ অতি-মানুষ হতে চায়" এবং অতি-মানুষ সম্ভবত অত্যন্ত মানুষ হতে চান; সুরেশ বাবুর মতে "এই হচ্ছে বিশ্বমানবের প্রগতির জীবন।" লেনিন সুপারম্যান, সুতরাং তাঁর আসার ফলে রাশিয়ার "বারো কোটি মানুষ" হয়তো "বারো কোটি লেনিনে পরিণত হবে" এবং তখনই সুরেশ বাবু ধ'রে নিতে পারবেন যে "সুপার-লেনিনের আবির্ভাবের সময় হয়েছে।"

কিন্তু তাই কি হয়? মানুষের "প্রগতির জীবন" কি এমনি

ধারা নামতার পথেই? বুদ্ধের আসাব ফলে কোটিকোটি লোক বৌদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তাদের কেউ কি দ্বিতীয় বুদ্ধ হতে পেরেচে? সুপার-বুদ্ধ দূরে থাক, তাঁর তিরোধানের পরে এতদিনে আরেকজন বুদ্ধও কি গজালো আর?

বরং তার উল্টোটাই দেখলাম। বুদ্ধের তিরোভাবের পর বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের, শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে নেড়ানেড়ির দল। এই কি "বিশ্বমানবের প্রগতির জীবন, তার ক্রমঃ ঔৎকর্ষের পথ, তার উচ্চ থেকে উচ্চতর সার্থকতার সাধনা"?

কিন্তু এমনই হয়। সুপাবম্যানের সম্মুখে যারা নিল্‌ডাউন হয়ে থাকে, সুপারম্যান স'রে পড়লেই তাবা হামগুড়িং লাভ করে। মেরুদণ্ডের যে স্বকীয় জোরে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ায় ক্রমাগত সাষ্টাঙ্গে সুপারম্যানের শ্রীচরণের ধূলো নিতে নিতে সেই জোরই-যে তাদের লোপ পেয়েচে! অসাধারণ মানুষ দেখলেই যাদের ঘাড় নীচু হয়ে আসে তারা নিজেকে দেখতে পায় না এবং নিজেকে খাটো ক'রে দেখে ব'লেই অপরকে অসাধারণ দেখে। আসলে অবনত মানুষদের মধ্যেই সুপার-ম্যান জন্মানো সম্ভব, এবং তাঁর আবির্ভাবের ফলে তাদের কোনোই শ্রীবৃদ্ধি হয় না! তেম্‌নি ধারা তারা অবনতই থাকে। অপার মহিমার অন্তর্ধানের পরে যদি তাদের আরো বেশি অবনতি নিতান্তই না ঘটে তবু তারা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' থেকে

যায়। এই কারণেই সুপারম্যান মানুষের অবনতির মূর্ত প্রতীক,—তার অবনতির প্রতিকার নয়।

কিন্তু সুরেশ বাবুর ফরমাস মতোই যদি হোতো, যদি অসাধারণ মানুষের আবির্ভাবের ফলে সকলে অসাধারণত্বের "পৈঠায় পৈঠায়" উত্তীর্ণ হ'তে থাকতো, যদি বারো কোটি বুদ্ধ, বারো কোটী চৈতন্য ও বারো কোটি লেনিনে ভূভারত আচ্ছন্ন হয়ে যেতো তাহলে "তার চেয়ে আনন্দের ব্যাপার" নাকি আর কিছু ছিল না। কিন্তু আমি মনে করি, তাও যদি হোতো তার চেয়ে অবিমিশ্র ব্যর্থতার ব্যাপার আর-কিছু ছিল না। কেননা অসাধারণ হয়ে, বিশেষ ক'রে এক বিশেষ টাইপের ধারা ধারণ করে মানুষের কোন সার্থকতাই নেই। পৃথিবীতে একটি লেনিনেরই প্রয়োজন ছিল, বারো কোটি দূরে থাক দু'টি লেনিন্ই সেখানে বাহুল্য; মানুষ তো "পাতা আর ফুল" নয়, তাই তড়াগে হাজার হাজার অরবিন্দ ফুটতে পারে; কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি অরবিন্দই যথেষ্ট। নিজত্বকে প্রকাশ ক'রেই মানুষ কৃতার্থ হয়, অপর কাউকে কপি ক'রে নয়। যতো বড়ো মহাত্মাই হোন তাঁর চরিত্রে দাগা বুলিয়ে খালি দাগা পেতে পারি; মহত্ত্ব পাইনে—মাহাত্ম্যও পাইনে।

অসাধারণ মানুষই-কিছু সম্পূর্ণ মানুষ নয়, একটা চোর একটা খুনেওতো অসাধারণ। সুপারম্যান হওয়াই মানুষের সাধনা নয়, মানুষের সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া। এই সাধনা

প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্ত ও অব্যক্ত চেতনায় অনুক্ষণ চলচে। এক টাইপের সম্পূর্ণতা সকলে লাভ করবে তা কখনোই নয়; প্রত্যেকের সম্পূর্ণতার মধ্যেই বিশিষ্ট রূপ ও স্বতন্ত্র ছন্দ দেখা দেবে। মানুষ পরিপূর্ণরূপে সম্পূর্ণ হবে এ-কথা সত্য, প্রতি পরবর্তী যুগেই আমরা পূর্ণতর মানুষ অধিকতর দেখতে পাবো—এবং তা অসাধারণদের মধ্যে নয়; অতি-সাধারণের মধ্যে। সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ হবে—এ যদি আজকের স্বপ্নও হয়, তাহলে কালকে এই-ই হবে অতি বাস্তবিক তথ্য।

পৃথিবীতে এখনো যে যুগ চলেচে তা একস্‌পেরিমেণ্টের যুগ। কিন্তু চিরদিন শুধু একস্‌পেরিমেণ্টই চলতে থাকবে, তার সম্পূর্ণতা আর ঘটবে না এ কখনোই সত্য হতে পারে না; কেননা তাহলে একস্‌পেরিমেণ্টের প্রয়োজনকেই অস্বীকার করতে হয়। প্রকৃতি আদিযুগে জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তার ফলে বালুচিথেরিয়াম বাইসন হিপোপোটোমাস প্রভৃতি অতি-জানোয়ারেরা দেখা দিয়েছিল; এখন মানুষকে নিয়ে প্রকৃতির পরীক্ষা চলেচে, তারই ফলে এখানে-সেখানে অতি-মানুষের আমদানি দেখা যাচ্ছে। এদেরও গতি ঐ বালুচিথেরিয়ামের পথেই। আসলে সুপারম্যানেরা হচ্ছে আজকের অসম্পূর্ণ অসুস্থ মানবতার রুগ্ন লক্ষণ; তার রোগের বিচিত্র উপসর্গ;—মানুষ-যে সুস্থ হতে চাচ্চে, স্বাভাবিক হতে চাচ্চে, এই উৎকট উদ্ভট চিহ্নগুলি তারই পরিচয়। মানুষ যখন সম্পূর্ণ হবে

তখন তার মধ্যে কোনো প্রকারেরই আতিশয্য থাকবে না; কেননা অভ্রভেদী কোনো-কিছু হয়ে ওঠা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা নয়। তখন তার মধ্যে শোভা পাবে একটা সহজ সঙ্গতি, স্বচ্ছন্দ সুষমা; শতদলের মতো সর্বতোমুখ পরিপূর্ণতা।

অত্যুচ্চ পাহাড়গুলো পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেনি—ওগুলো তার গর্বের নয়। তার সমতলতাই তার গৌরবের—কারণ তাই তাকে সম্পূর্ণ করেচে, সার্থক করেচে; সফল করেচে। পৃথিবীর সমতল হবার, সম্পূর্ণ হবার, একান্ত-চেষ্টারই পরিচয় ওই অসম পাহাড়গুলো—তার আদি যুগের জ্বলন্ত সাধনার বিষম নিদর্শন। কিন্তু পাহাড়েই যদি পৃথিবীর সৃষ্টি-নৈপুণ্য শেষ হোতো তাহলে তার সেই বিরাট বন্ধ্যাত্বের লজ্জা পাহাড়কেও ছাপিয়ে যেতো

রবীন্দ্রনাথই বলেন:

"আদ্যযুগের কীর্তিবলে পাহাড় হোলো উচ্চ,
লক্ষ যুগের স্বপ্নে এলো প্রথম ফুলের গুচ্ছ।"

পাহাড় বড়ো হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, শেষও নয়। ফুলই সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে শতদল ফুটতে যদি লক্ষ যুগ দেরি থাকে তবে লক্ষ যুগই দেরি আছে, কিন্তু তাই ব'লে একথা কিছুতেই মানতে পারবো না যে আজকের পাহাড়ে-মানুষেরাই মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত, এবং পাহাড়ের 'সারমন' মেনে চলা ছাড়া মানুষের সার্থকতার আর পথ নেই। কেননা মানুষ যখন সম্পূর্ণ হবে তখন আপনার অন্তর্লোক থেকে আপনি বিকশিত হয়েই হবে—পাহাড় ডিঙিয়ে বা পাহাড়কে টেক্কা মেরে নয়।

সুপা[redacted]

পূর্ব প্রবন্ধের উত্তরছলে 'নবশক্তি'তে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শ্রদ্ধা সহকারে আমার শ্রাদ্ধ করেছেন—অত্যন্ত সন্তর্পণে আমার প্রবন্ধের আসল কথাটি এড়িয়ে গিয়ে। আমার এই তর্পণে আমি তৃপ্ত। আমার বক্তব্য বাদ দিয়ে আমি-ব্যক্তিটি তাঁর প্রতিবাদের বিষয় হয়েছি, এমন কি তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামাতেও আমারই অবস্থান! আমাকে তিনি ভুল বুঝেছেন এ আমার গৌরব, আমার ব্যক্তব্যকে তিনি ভুল বোঝাতে চেয়েছেন এ আমার আরো বেশি গৌরব।

পাটিগণিতের ধারায় সত্য-কে যাচাই করবার আয়াস ও প্রয়াস সুরেশবাবুর রচনায় দেখা গেল। তিনি মুনিব্যক্তি, সুতরাং মতিভ্রম তাঁর হবে এ আর বেশি কি! মুনিত্বকে অতিক্রম করার সাধ্য তাঁর নেই, জানি, তবু তাঁকে বলি—পাটিগণিতের মধ্যে সত্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্য পাটিগণিতের ধার মাড়ায় না, সে-পাট্ই তার নয়। অঙ্কের মতো ছক্কাটা বাঁধা নক্সায় পরিপাটি হয়ে দেখা দেবার তার কোনো গরজ নেই। সত্যেরই সেই সাহস আছে, পরস্পর-বিরোধী রূপে সে-ই দেখা দিতে পারে।

আমার মধ্যে mediocrity complex আছে এই কথাই সুরেশ বাবু সযত্নে প্রমাণ করতে চেয়েছেন! এই জন্যই আছে, যেহেতু আমার উদ্ধারের জন্য কোনো সুপারম্যানের কাছে

উধ্বর্নেত্রে যুক্তকর হতে আমি প্রস্তুত নাই। আমার জন্য তো নয়ই—মানুষের জন্যও না। পেতে হ'লে যেখান থেকে পেতে হয়, এমন কি সুপারম্যানকেও, আমার অপরাধ, আমি সেখানেই হাত পেতেছি; অনন্তের অন্তর ও অন্তরের অনন্ত যেখানে এসে মিলেছে সেইখানে। যেখানে কোনো সুপারম্যানেরই একছত্র নয়, সব মানুষেরই সমান অধিকার, যেখানে যেতে হ'লে নিজেই যেতে হয়, সুপারম্যানের হাত ধরলে চলে না। এ যদি আমার mediocrity complex হয় তাহলে সুরেশবাবুর যে-অবস্থা তাকে বলবো mediocrity simple। কেননা চিরদিন mediocre লোকেরাই ত'রে যাবার ভরসায় সুপারম্যানের দোরে ধর্না দিয়ে থাকে। কিন্তু কাঁধে চেপে যে চলে সে-যে চলে এ কথা বলি কি ক'রে—হোলোই বা সেটা সুপারম্যানের বা শ্রীঅবতারের শ্রী কাঁধ!

সুরেশ বাবু আমার প্রবন্ধ প'ড়ে আবিষ্কার করেচেন যে আমি নাকি "প্রাণপণে কাবুলিওয়ালাত্ব অর্থাৎ সাধারণ-মানুষত্ব-কে ছাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করচি!" তিনি প্রচণ্ড ভুল করেচেন, সেরকম দুর্লম্ফন-স্পৃহা আদপেই নেই আমার! আমার ধাতুতেই তা নেই। আর, ন্যাজ যদি ভেতরে না থাকে কারু সাধ্য কি তাকে টেনে বার করে? নিজের যোগবলেও নয়, অপরের বলযোগেও না, এমন কি তা সুপারম্যানেরও আকর্ষণ-শক্তির বাইরে!

মানুষের জন্য আমি দাঁড়িয়েছি এ কথা বললে স্পর্ধার মতো শোনাবে, তা আমি বলিনে; কিন্তু মানুষের মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি এই কথাই আমি বলতে চাই। কাবুলিওয়ালা কেন, ক্যানিবল্‌কেও ছেড়ে উঠতে আমি রাজি নই—তাদের নিয়ে উঠতেই আমি চাই। পাশাপাশি বাস ক'রেও একদল মানুষ আরেক দলকে যে ছেড়ে উঠেচে এটাই মানুষের লজ্জা—যারা ছেড়ে উঠেচে এবং যাদের ছেড়ে উঠেচে উভয়েরই! এইখানেই পশুর কাছে মানুষের পরাজয়।

কিন্তু ছেড়ে উঠলেই কি ছাড়িয়ে ওঠা যায়? সুপার-ম্যানেরও ভেতরে সেই কাবুলিকে দেখি, ক্যানিবল্‌কেও দেখি।

সেকালের মহাপুরুষেরা সঙ্ঘ মঠ প্রভৃতি গড়তেন, একালের মহাত্মারা গড়েন আশ্রম, আড্ডা, য়্যাসোসিয়েশন্‌ ইত্যাদি। নানা আকারে ও প্রকারে বিচিত্র তাঁদের এই আশ্রম-রচনার মূলে কী? নানান তত্ত্বকথার আড়ালে—নামান্তরে আর রূপান্তরে—সেই মৌলিক ক্ষুধা। স্রেফ্‌ ক্যানিবল-ইন্‌ষ্টিঙ্ক্‌ট্‌। শিকারের সন্ধানে বাইরে না গিয়ে আশ্রম-মৃগয়া করার সুপার-ম্যানুভার। ক্যানিবল্‌ মানুষকে উদরসাৎ করে, সুপারম্যান করেন আত্মসাৎ। আমি যখন বলেছিলাম যে, Superman stands for none but himself, তখন তাঁর self থেকে তাঁর spiritual উদরকে আমি বাদ দিই নি। কিন্তু সুরেশবাবু আমাকে একটি "মজার কথা" শুনিয়েছেন, সেটি এই যে, "মহাপুরুষদের standing

for themselves is the best and effective way of standing for others।"

অর্থাৎ, বক যখন পুকুর পাড়ে দাঁড়ায় তখন সে নিষ্কাম চিত্তে নিজের জন্য দাঁড়ায় বল্লে ভুল বলা হবে, সে মাছের জন্যও দাঁড়ায় বটে! গরুকে দেখলে শস্য গদ্‌গদ হয় কিনা জানিনে, কিন্তু গুরুকে দেখে শিষ্য আত্মহারা! কালের কুটিল গতি—সেকালের মহারথীরা অশ্বমেধ করতেন, একালের অর্ধরথীদের গর্দভমেধেই আনন্দ!

সুরেশ বাবু বলেচেন যে আমার

"সুপারম্যানের আইডিয়ার সঙ্গে নিট্‌শে কিম্বা বার্ণার্ড-শ কিম্বা শ্রীঅরবিন্দ এঁদের কারো সুপারম্যানের আইডিয়াই মেলে না।"

এবং সেইসঙ্গে যেটা বলেননি সেটা হচ্ছে যে তাঁর সুপারম্যানের আইডিয়ার সঙ্গেও মেলে না! কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন, সুপারম্যানের আইডিয়াটাই আসলে আমার নয়, সে-আইডিয়া তাঁর। এবং তাঁর সুপারম্যানের আইডিয়ারই আমি প্রতিবাদ করেচি—নিট্‌শে, বার্ণার্ড-শ বা শ্রীঅরবিন্দের আইডিয়ার কথাই এখানে ওঠে না। আমি সুরেশবাবুকে স্বতন্ত্র Idealist ব'লে মনে করেছিলুম, তিনি যে নিট্‌শে, বার্ণার্ড-শ বা শ্রীঅরবিন্দের Idea-List-মাত্র একথা কে জানতো?

এখন সুরেশবাবুর সুপারম্যানের আইডিয়াটা কী?… না, "অসংখ্য সাধারণেব মাঝে মুষ্টিমেয় অসাধারণ"…(…প্রবাসী, অগ্রহায়ণ) ইংরেজিতে যার অর্থ হবে Outstanding Personalities। আমি বলতে চেয়েছি যে এই Outstanding Personalityরা যতই astounding হোন্‌না, ব্যক্তিহিসেবে অসম্পূর্ণ; অভিব্যক্তির দিক থেকেও উৎকৃষ্ট নন, এমনকি সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এমনও বলতে পারিনে। ভবিষ্যতের সুপারম্যানেরা কী হবে তা এখনকার কল্পনা মাত্র, তাব ছায়াব সঙ্গে আমার লড়াই নয়। অতীতের বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য যদি সুপারম্যান হয়ে থাকেন, তো হয়েছেন, তা নিয়েও আমার কোনো মাথাব্যথা নেই; কেবল, আজকের জগতে প্রযোগনিপুণ যেসব মানুষ সর্বসাধারণকে খর্বিত রেখে গর্বিত, সবাইকে খাটো ক'রে নিজেদের বড়ো করতে চাচ্চেন আমার লড়াই তাঁদের সঙ্গেই। এবং তাঁদের যাঁরা কলমের জোরে জাহির করতে যাচ্চেন তাঁদের সঙ্গেও বটে।… সে-যুগে মহম্মদ হজরত ও নেপোলিয়নকে তলোয়ারের জোরে দাঁড়াতে হয়েছিল; এযুগের সুপারম্যানের অনুচরেরা কলমকেই হাতিয়ারের কাজে লাগিয়েচেন! কিন্তু লেখনী হচ্ছে এমন তলোয়ার যার দুধারে ধার, চালাতে না জানলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারতে গিয়ে সুপারম্যানকেই মেরে বসে কিম্বা নিজেকেই জখম করে। অক্ষম হাতের অস্ত্রের বিপদই এই! তবে কিনা,

নিজের নাক কেটেও অপরকে নাকাল করা যায়···সেটাও একরকমের উন্নাসিকতা। তাতেও একটা আনন্দ আছে।

সুরেশবাবু নেপোলিয়নকে সুপারম্যান মনে করেন। অথচ তাঁরই ধারণা-মতে, নেপোলিয়ন যদি হয়, মুসোলিনীই-বা না হবেন কেন? এবং বাচ্চাইসাকোই-বা কী অপরাধ করলো? সুরেশবাবু নিজেই-বা কেন বাদ যাবেন? তিনিও তো "মুষ্টিমেয় অসাধারণের" মধ্যেই? যদিচ এ-আশঙ্কা আমার থাকবেই যে, আশ্রমমৃগ প্লাস্ হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ প্লাস্ নাথিং এল্‌স্ আশ্রমমৃগয়ার পক্ষে যারপর-নাই হলেও, হয়তো সুপারম্যান হবার বেলায় যথেষ্ট নয়। কিন্তু নাই হোলো, সুপারম্যানিয়ার রোগ ধরতে তাই ঢের।

সুরেশবাবুর অসাধারণত্বের আরেকটি পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করেচে। সেটি হচ্চে এই, আমার যে-সব মত তিনি মানতে বাধ্য হয়েছেন সে-সম্বন্ধে তিনি বলেচেন আমিই নাকি তাঁর সঙ্গে 'একমত' হয়েছি! যেমন, প্রবাসীর "কাবুলিওয়ালায়" তাঁর মত ছিল যে

> "রাশিয়ার বারো কোটি লোক যেদিন বারো কোটি লেনিন হবে সেদিনই সুপার-লেনিনের আবির্ভাবের সময় হবে।"

সে-সময়ে, রাশিয়ার বারো কোটি লোকের লেনিনত্বে—লেনিন হওয়ার সার্থকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল।

আমি তাঁর সঙ্গে 'একমত' হয়ে জানালুম যে ইতিহাসে এর নজির নেই ; বুদ্ধের জন্মের পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, কোটি কোটি বুদ্ধ দূরে থাক, দ্বিতীয় একটা বুদ্ধই এতদিনে গজালো না, সুপার-বুদ্ধ তো পরের কথা ! বুদ্ধের বারোকোটি-তম সংস্করণ নাই হোক, কারু পক্ষে যদি এতদিনে আট-আনা সংস্করণের বুদ্ধ হওয়াও সম্ভব হোতো, সুরেশ বাবু আজ আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতেন ! কিন্তু সেই আট-আনা বুদ্ধের ষোলো আনাই যে ব্যর্থ হয়েছে তার অপরিসীম ট্রাজিডি সুরেশবাবুর অতিবুদ্ধিকে আঘাত করতো না।

আমি প্রশ্ন করেছিলুম—"বুদ্ধ আসার ফলে কোটি কোটি লোক বৌদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তাদের কেউ কি দ্বিতীয় বুদ্ধ হতে পেরেচে ?"

এর জবাব না দিয়ে সুরেশবাবু পাল্‌টা প্রশ্ন করেচেন—

"বুদ্ধ আসার ফলে তাঁর সাধনা, তাঁর উপলব্ধ জ্ঞানের ফলে বিশ্বমনের—মানব-সভ্যতার কি কোনো লাভই হয় নি ?"

এ-প্রশ্নই এখানে অবান্তর। মানব-সভ্যতার লাভালাভের কথা নয়, এখানে কথা হচ্ছে মানুষের সুপারম্যান্ হওয়ার। সুরেশ বাবুর ধারণা অনুসারে, বুদ্ধের আসার একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে সকলকে, অন্ততপক্ষে জনকয়েককেও বুদ্ধত্বে উপনীত করা, যার ফলে সেই সকল বা সেই কয়েকজন বুদ্ধের ভেতর থেকে

সুপারবুদ্ধ উত্তীর্ণ হতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল, বুদ্ধ তাঁকে শোচনীয় ভাবে হতাশ করেচেন, এমন কি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেচেন—একথা বল্লেও বেশি বলা হবে না !

এক জায়গায় সুরেশবাবু কিছুতেই আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। সেটা পাটীগণিতের ব্যাপারে। সেখানে তাঁর "স্কুল-মাষ্টারী"-বিদ্যে তাঁর অমানুষিক বুদ্ধিকেও টেক্কা দিয়েচে ! তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে—পঞ্চাশ টাকা ও হাজার টাকা সমান কিসে? টাকার মূল্য-যে আপেক্ষিক এটাও-কি সুরেশবাবুকে বোঝাতে হবে? দশ টাকার পুঁতির মালা দিয়ে আফ্রিকার পল্লীতে যদি হাজার টাকার গজমতি মেলে তখন কি বলবো না যে, দশ টাকার মূল্য সেখানে হাজার টাকার সমান? এক পাউণ্ড দিলে সেদিনও বিশ হাজার মার্ক মিল্‌তো ! বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হাজার টাকা দিয়ে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমরা পাই ভাবী কোনো শ্রমতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাণাকড়ি না দিয়েও সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আমরা সমানাধিকারী হতে পারি।

টাকার মূল্য আপেক্ষিক বটে, কিন্তু মানুষের মূল্য আপেক্ষিক নয়। অন্য কারো বা কিছুর সম্পর্কে তার মূল্য নির্ভর করে না, করে তার নিজের ওপর। পাটীগণিতের ফরমূলা দিয়ে মানুষের সত্যের প্রমাণ হয় না, পরিমাণও হয় না। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের সমান—অঙ্ক-যোগে নয়, অনন্তের যোগাযোগে; এই অনন্ত সুপারম্যানের

এক্তিয়ারে নেই যে তিনি উইল ক'রে দিলেই আর সবাই পাবে। এ আছে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এবং একে পেতে হবে পরের সুকৃতিতে নয়, নিজের স্বী-কৃতিতে। নিজের কৃতিত্বে।

আমি বলেচি সম্পুর্ণ মানুষে ও অসম্পূর্ণ মানুষে তফাৎ বেশি নয়। সেই কথাই আমি আবার বলচি। সম্পূর্ণ মানুষ সাধারণ মানুষেরই একজন। সম্পূর্ণ মানুষ ও অসম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে সেই সম্বন্ধ—গাছের সঙ্গে বীজের যে-সম্বন্ধ, তার মধ্যে পার্থক্যও যতখানি, ঐক্যও ততখানি। বীজ তার সম্ভাবনা নিয়ে সম্ভাবিত গাছের সমান। গাছের মধ্যে যে-অনন্ত সফল হয়েছেন, বীজের মধ্যে তিনিই প্রচ্ছন্ন। স্বীয় সাফল্যের জন্যে প্রতীক্ষমান। যে-মুহূর্তে বীজ অনন্তের যোগে আপনাকে প্রকাশ করতে সুরু করবে সেই মুহূর্ত থেকেই সে গাছের সগোত্র।

কিন্তু পাটীগণিতের সুরেশ বাবু এই বীজগণিতে ঘাড় নাড়বেন, কেন না তাঁর vision যেমন অসাধারণ তেমনি ভীষণ। যে-অঙ্কুর বাড়চে সে এত অগোচরে বাড়চে যে তার সেই বাড়, বর্ধিত গাছের পাশে তাঁর স্থূলদৃষ্টিতে পড়বেই না, কেননা তাঁর হচ্ছে সেই চোখ যে-চোখে তিনি মানুষের মধ্যেও ভেড়া দেখেন। মানুষের মধ্যে ভেড়াও হয়তো আছে, তার সাথে মানুষও আছে; কিন্তু কামাখ্যায় গিয়ে সুপার-উওম্যানের পাল্লায় পড়ে যে simple মানুষ ভেড়া হয় সে অসাধারণ হয়ে

দাঁড়ায় দুদিকেই। সাধারণ মানুষ ব'লে তাঁর অপমান করা যায় না, অথচ তাঁকে সাধারণ ভেড়া বললে নেহাৎ ভেড়াদের মানহানি ঘটে।

তাহলেও সুরেশ বাবু গণিতজ্ঞ লোক। কাবুলিওয়ালা প্লাস অনন্ত ইজ ইকুয়ল টু রবীন্দ্রনাথ প্লাস অনন্ত, অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা না হোক, অঙ্ক-দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বুঝতে পারবেন। কেননা, "স্কুলমাষ্টারেরা" গণিতটাই ভালো বোঝে—গণনা দ্বারা গণ্য করতে পারাটা লঘু-চেতনার পক্ষে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা কিনা!

তবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাবুলিওয়ালার তফাৎ আছে,—আর সে-তফাৎ সামান্যই। তা হচ্ছে এই, রবীন্দ্রনাথের সহিত অনন্তের যোগ সহজ ও সত্য হয়েছে, কাবুলিওয়ালার সহিত তা হয় নি। তার যে অনন্ত ঐশ্বর্য আছে এ কথা কাবুলিওয়ালা জানেই না। কিন্তু যে-মূহূর্তেই সে জানবে সেই মুহূর্তেই সে তার অধিকারী হবে। সুতরাং যে-তফাৎটুকু দাঁড়াচ্চে সে-তফাৎটুকু হচ্চে মূহূর্তের—পরশমণির সামনে দাঁড়িয়ে সোনার সঙ্গে লোহার যে-তফাৎ।

কিন্তু এই জানার একটা বাধা আছে। তা এই, ক্ষুধাতুর ক্ষুণ্ণ-মুখ মানুষকে কিছুতেই অনন্তের দিকে উন্মুখ করানো যায় না। এই জন্যই, মানুষের আত্মিক প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা তার আর্থিক স্থিতি। রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেচেন তার মূলে শুধুই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই একথা সত্য, কিন্তু এ-

কথাও তেমনি সত্য যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে তিনি আত্ম-প্রকাশ করতে পারতেন না। মনে করা যাক্, রবীন্দ্রনাথকে ছোটো বেলায় কেউ চুরি ক'রে নিয়ে চ-বাগানে বিক্রি করতো, তাহলে আজ চা-পাতার চয়নিকা ক'রেই তাঁর কাল কাটতে হোতো এই রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেতুম না।

রবীন্দ্রনাথ না এলে আমাদের সমাজ কতটা অসম্পূর্ণ থাক্তো তা আমরা কল্পনা করতে পারি এবং কল্পনা ক'রে ভীত হই। কিন্তু সমাজের বিরাট অসম্পূর্ণতার তুলনায় এ ভয় সামান্যই। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতই সম্পূর্ণতার অধিকারী এমন শতকোটি মানুষ আজ অপ্রকাশিত রয়েচে, যারা না প্রকাশ পেলে মানুষের সমাজ কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। হবার নয়।

বুদ্ধ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহাত্মাই মানুষকে আত্মার মুক্তি দিতে এসে ব্যর্থকাম হয়েচেন, কিন্তু লেনিন্ এই জন্যই কৃতার্থ যে তিনি জেনেছিলেন ও-জিনিস কারু হাতে তুলে দেওয়া যায় না, যেহেতু ও সবার হাতেই রয়েচে। তিনি ক'রে গেছেন সবার ভাতের ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, না খেয়ে শুকিয়ে ম'লেও ভেবো না, কেন না ওতে দেহই শুকোবে; তোমার আত্মার শুষ্কতা নেই! কিন্তু লেনিন্ই প্রথম এসে বল্লেন, দেহই-বা শুকোবে কেন? তারই আত্মস্থ হওয়ার দরকার—হওয়ার সার্থকতা যে-দেহী, যে-বিদেহী তার নয়।

এই জন্যই, আত্মবাদী হয়েও সাম্যবাদী হতে আমার বাধে

না। এই জন্যই, আত্মার ব্যাপারে, আত্মীয়তার ব্যাপারে ও আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে চরম individualist হয়েও Proletariat-এর Dictatorship পর্যন্ত মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। কারণ আমি জানি সমানাধিকারবাদই মানুষকে মুক্ত করবে দেহের ক্ষুধা থেকে, আত্মার ক্ষুধার দিকে—সমস্ত মানুষের আত্মপ্রকাশ তখনই সহজ ও সম্ভব হবে। কেননা ক্ষুধার দাবীর কাছে যদি অনন্তের ভাঁড়ার-ঘর না উন্মুক্ত হয়, সুপারম্যানের ট্যাঁকে তার চাবি নেই।

সুপারম্যানের ধান ভান্‌তে গিয়ে সুরেশবাবু সাম্যবাদের অশিবের গীত গেয়েছেন। তাঁর লেখায় এই বাহাদুরিটা চমক্‌দার! কোনো vital point-এ তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলে সেখান থেকে তিনি স'রে পড়েন, অবশেষে একটা সাধারণ phrase বা clause-এর গলিপথ দিয়ে ঘুরে এসে পাল্‌টা আক্রমণ লাগান্— গরল-উদ্‌গারের তাঁর এই সাহিত্যিক গরিলা-যুদ্ধটি বেশ। কোনো উপলক্ষ্যে আমি বলেছিলুম: "সত্যিকারের অভিনেতা বাংলার ষ্টেজে একটিও নেই, তা আছে পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে: তেমনি সত্যিকারের যাঁরা পলিটিশিয়ান তাঁরা হচ্ছেন আজকের সাহিত্যিক। এক্‌স্‌প্লয়টেশন্, ইন্‌ট্রিগ, ডিপ্লোমাসি—কিছুতেই তাঁরা কম যান না; বিশমার্কের উপরে তাঁরা বাইশমার্ক।" এখন দেখছি যুদ্ধ-বিদ্যাতেও তাঁরা কম পারদর্শী নন্। কোথায় ছেড়ে কোথায় শত্রুকে বিদ্ধ করতে হবে সুরেশবাবু তাতে

সিদ্ধহস্ত। Marx-এর সঙ্গে বিরোধ থাকলেও Marksman হতে তাঁর বাধে নি।

কিন্তু যতই valour তিনি দেখান না, সাহিত্যিক-'ডি-ভ্যালেরা' তিনি নন্। তাই ফাঁস্ থেকে মাথা বাঁচাতে গিয়ে ফাঁদে পা দিয়ে বসেন! প্রবাসীর প্রবন্ধে তাঁর mood ও তাঁর voice থেকে বোঝা শক্ত ছিল না যে তিনি Superman কথাটিকে যে ডিগ্রিতে ব্যবহার করেচেন তা Comparative. অর্থাৎ superman থাকলে অনিবার্যরূপে lesser men-ও থাকবে।

আমি বলেছিলুম—না। সমস্ত মানুষই সম্পূর্ণ হবে। "সম্পূর্ণ মানুষ" বলতে এখানে ধরা যাক যে তারা superior type-এর মানুষ; কিন্তু তাদের মাঝে কোনো স্তর-বিভাগ থাকবে না—আর্থিক জগতেও না, আত্মিক জগতেও না।

সুরেশ বাবু বলেন—সে কি কথা! যে গান গায় আর যে কয়লা সংবরাহ করে তারা কি এক স্তরের হতে পারে? এ অসাম্য থাকবেই।

তার জবাব অবিশ্যি এই—যে গান গায়, পালা ক'রে সে যদি কয়লা যোগায়—যোগান্ দিতে বাধ্য হয়—তাহলে যে কয়লা যোগাতো সেও গান গাবার ফুরসৎ পাবে।

সুরেশ বাবু বলেন—তা হতেই পারে না। Lesser man-দের থাকতেই হবে, "কেননা পাতার সার্থকতা যেমন

ফুলে, তেমনি সাধারণ মানুষের সার্থকতা অসাধারণ মানুষে।"

আমি বলি—মানলুম পাতার সার্থকতা ফুলে, কিন্তু সেইখানেই শেষ কথা নেয়। ফুলের সার্থকতা আবার ফলে, ফলের সার্থকতা বীজে, বীজের সার্থকতা গাছে, এবং গাছের সার্থকতা আবার পাতায়! কিন্তু মানুষের বেলা?

এর উত্তরে সুরেশবাবু কিছু বলেন না; তবে যে-কথা বলতে চান তা হয়ত এই যে, সাধারণ মানুষের সার্থকতায় সুপারম্যানের স্বার্থ কোথায়? অতএব বুঝতে হবে সুপারম্যানের সার্থকতাতেই হতভাগ্যদের স্বার্থ। কেননা "সুপারম্যানকে তারা ব্যর্থ করতে পারে একমাত্র নিজের মৃত্যু অঙ্গীকার ক'রে।" (কাবুলিওয়ালা, প্রবাসী)। অতএব কোনো রকমে বেঁচে থাকতে হলে কায়-মন-প্রাণ দিয়ে অসাধারণ মানুষদের সার্থকতার ইন্ধন তাদের যোগাতে হবেই।

আমি এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলেছিলাম। অসাধারণ মানুষে সাধারণের সার্থকতা থাক বা না থাক, অসাধারণ মানুষের সার্থকতা হচ্ছে অবনত ও অসম্পূর্ণ মানুষে। কেননা সুপারম্যান কথাটা আপেক্ষিক—এইজন্যই সুপারম্যানকে lesser-man-এর অপেক্ষা রাখতেই হয়। যেমন ফুলকে পাতার।

সুরেশ বাবু বলেন—"ফুল গাছের ফুল যেমন একটা পরম

সত্য, অসংখ্য সাধারণের মাঝে মুষ্টিমেয় অসাধারণ তেমনি বিশ্বমানবের একটা পরম সত্য।"

অর্থাৎ তাঁর মতে, সুপারম্যান-শিপের পরীক্ষায় পাশ করবে অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন, আব সাধাবণ লোক চিরদিন অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই ফেল্ করতে থাকবে। তাদের পরীক্ষার খাতায় পাতায়-পাতায় যে ফুলিশ্‌নেস্—সেটা থাক্—থাকা ভালো—চিরদিনের জন্যেই। কেননা সেটা তাঁর কথিত মহৎ সত্যকেই সপ্রমাণ করে। আর সেই প্রমাণের জন্যই তার থাকার দরকার। পাতাবাহারীর মধ্যেই তো ফুলের বাহার!

কিন্তু এ কী? নবশক্তির প্রবন্ধে দেখি, তাঁর সে-ধারণা যেন বদলেচে। তিনি বলচেন—"শিবরামবাবু বলেন (সমস্ত) মানুষ "সম্পূর্ণ মানুষ" হবে; আমি বলি (সমস্ত) মানুষ অতিমানুষ (অর্থাৎ Superman) হবে।" *

তাই যদি হয় তাহলে ত সব অনর্থ ঘোঁচে—অবশ্য 'সুপারম্যান' কথাটির অনর্থ বাদে। এই কথা গোড়ায় স্বীকার করলেই তো হোতো—এ-অনর্থক কচায়ন তবে কেন? "বিশ্ব-মানবের একটা পরম সত্য" যে তিন হপ্তাব নোটিশে সুরেশ

* 'সমস্ত' কথাটা আমার যোগ-করা, কেননা যখনি আমি 'মানুষ' বলি, 'সমস্ত মানুষেব' কথাই বলি। সুরেশবাবু হয়তো মানুষ বলতে তাঁর মতই দুচারজনা আর তাদের ভাইবেরাদরকেই বোঝেন— কিন্তু তাহলেও, সেই বেড়া ভেঙে তাঁকে এখানে সমস্ত মানুষের ঘেরাও-এর মধ্যে আনা হয়েচে।

বাবুর মাথা vacate ক'রে চলে গেল, এতে পরম সত্যেরও নিষ্কৃতি, বিশ্বমানবও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, আমিও বাঁচলুম! তবু এই ক্ষোভ আমার, "সুপারম্যানকে" মেরে সুরেশবাবুর না বাঁচাই যেন ভালো ছিল!

অবশেষে সুরেশবাবুর প্রতি আমার এই নিবেদন, তিনি ফুলের কথাই যেন ভাবেন, পাতার সার্থকতার জন্য দুশ্চিন্তা যেন তাঁর না হয়—কেননা তার চেয়ে গুরুতর calamity পাতার আর কিছু হতে পারে না। আমি তাঁকে এই কথা বলি—ফুলে নয়, পাতার সার্থকথা মোলে,—তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে সুরু ক'রে সেদিনের লয়েড জর্জ পর্যন্ত—কথায় নাহয় কাজে—বলে এসেচেন। আর, সেই কথায় মরীয়া হয়ে চিরদিনই তারা সুপার-চক্রে বা চক্রান্তে ম'রে এসেচে—সুরেশ বাবু তাদের নতুন ক'রে আর বেশি করে নাই মারলেন! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-র কী দরকার?

মানুষের সম্পূর্ণতা বলতে আমি কী বুঝি এবার সেই কথা। সেই কথাটা সম্পূর্ণ ক'রে বলা এখানে সম্ভব নয়, তার ইঙ্গিতটুকু কেবল আমি দেবো। কী ক'রে এই সম্পূর্ণতা মানুষ লাভ করবে তারও আলোচনা এখানে নয়।

মানুষের সম্পূর্ণতার গোড়ার কথা তার দেহ মন ও বুদ্ধির পূর্ণতা। আমরা এমন মানুষ দেখেচি (মানুষ বলতে নরনারী উভয়কেই ধরা হচ্ছে) যার দেহ অপূর্ব—কিন্তু মন ও মস্তিষ্ক

অপরিণত; এবং এমন অসাধারণ বুদ্ধিমান দেখেছি যার মন ব'লে বালাই নেই; আবার এমনও মনস্বী হৃদয়বান দেখা গেছে যাঁকে রূপবান বলা আদপেই চলে না। এঁরা কেউই সম্পূর্ণ মানুষ নন; কেননা মানুষ যদি দেহে সুন্দর, মনে সরস এবং বুদ্ধিতে বিচারক্ষম—এক কথায় দেহ-মন-মস্তিষ্কে সম্পূর্ণ না হয় তাহলে সে কিছুতেই প্রকাশে ও অবকাশে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করতে পারে না—নিজেকেও না, অনন্তকেও না। নিজের কাছের অপর-কাউকেও নয়।

রবীন্দ্রনাথকে কেন সম্পূর্ণ বলি এখন সেই কথাটা স্পষ্ট হবে। তিনি সম্পূর্ণ—তাঁর দেহের রূপে, তাঁর মনের সরসতায়, তাঁর বুদ্ধির বিচার-শীলতায়। তাঁর কবিতার জন্য তিনি সম্পূর্ণ নন—তাঁর কবিতার চেয়ে তাঁর জীবন বড়ো, তিনি কবিতা না লিখলেও পারতেন। তবু তিনি কবিতা লিখলেন কেন? তাঁর সম্পূর্ণতার স্বাদ সবাইকে দেবার জন্য। তাঁর মতই সম্পূর্ণ হবার প্রেরণা সব মানুষকে দিতেই। এই জন্যই তাঁর কবিতার সার্থকতা—এবং এই-সার্থকতাই পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-রচনার ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির। যেদিন পৃথিবীর সব মানুষ সম্পূর্ণ হবে সেদিন কবিতা লেখার প্রয়োজন থাকবে না, এবং আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি সেদিন কেউ কবিতা লিখবেও না। যেহেতু তখন তারা জীবনের স্বপ্ন না দেখে জীবন-যাপন করবে। তাদের জীবনই হয়ে উঠবে কবিতা।

সম্পূর্ণতার আসল কথা হচ্ছে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য—সুতরাং "কোনো-কিছুরই আতিশয্যের" সেখানে ঠাঁই নেই—একথা বোঝা তেমন কঠিন নয়। কারো যদি মাথাই না থাকে তাকে আমরা সম্পূর্ণ বলবো না, তেমনি কারো যদি কেবল মাথাটাই থেকে থাকে তাকেই বা সম্পূর্ণ বলি কী ক'রে? অবশ্য তাকে 'অসাধারণ' বা 'অতি-মানুষ' বলতে আমার বাধা নেই। অতিশয় পেটমোটা বা অত্যন্ত মাথামোটা লোক দেখলে আমাদের হাসি পায়। আতিশয্য জিনিসটাই হাস্যকর—এবং প্রত্যেক হাস্যকর বস্তুর মতো এরও গভীরতায় ব্যর্থতার কারুণ্য।

আমি বলচি সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ হলেও তাদের প্রকাশে বৈচিত্র্য থাকবে। সুরেশ বাবুর সমস্যা—তা হয় কী ক'রে?

প্রথমে দেহের কথাই ধরি। আমি অনেক রূপ দেখেচি—যারা প্রত্যেকেই পরম সুন্দর—কিন্তু ছুটো একরূপ দেখিনি। আগামী কাল প্রভাতে যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুন্দর হয়ে ওঠে তখনও দেখা যাবে তাদের সৌন্দর্যের মধ্যে সাম্যও যতখানি বৈচিত্র্যও ততখানি। দেহের প্রকাশে যা সত্য, মনের ও বুদ্ধির প্রকাশের বেলাও তাই—একই সত্য স্বপ্রকাশ; কেননা দেহ ও মন এই ছুই নিয়েই মানুষের আত্ম-প্রকাশ। দেহের অন্তরে যার মুল—দেহের বাইরে—পারস্পরিক জীবনে—তারই মূল্য—তারই প্রফুল্লতা; মানুষের আত্মপ্রকাশ বলতে বুঝি মানুষের অন্তরঙ্গ অনন্তেরই বহিপ্র্রকাশ। অনন্তের অনন্তত্বের প্রমাণ এইখানেই—মানুষের মানদণ্ডেই।

কবি-জয়ন্তী

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁকে Superman বলতে আমি রাজি নই। Superman বললে তাঁর অপমান করা হয়।

অনন্তের যোগে ও জীবনের ভোগে মানুষ সম্পূর্ণ।

কেবলমাত্র জীবন-সম্ভোগে চরিতার্থতা আছে কিন্তু সম্পূর্ণতা নেই ; জীবনের সার্থকতা ও মানবিক পূর্ণতা এক কথা নয়, যেহেতু মানুষ তার ব্যক্ত জীবনের চেয়ে বড়ো। সাহিত্যিকদের ভেতর থেকেই এর উদাহরণ দেওয়া যায়। শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলাম—এঁরা চরিতার্থ (fulfilled), কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ বলতে যা বোঝায় এঁরা তা নন্। সাহিত্য-গণ্ডীর বাইরে, জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে অসংখ্য সার্থক ব্যক্তি আছেন যাঁরা অসম্পূর্ণ। তারো বাইরে আছে পৃথিবীর পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই যারা অসম্পূর্ণও বটে, অচরিতার্থও বটে।

কেবলমাত্র অনন্তের যোগেও মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে না। জীবনের যোগ-বিচ্ছিন্ন অনেক যোগী-ঋষি হয়ত হিমালয়ের গুহাকক্ষে সমাধিস্থ আছেন, তাঁদের মানুষ বলতে আমি কুণ্ঠিত। উদাহরণের অন্বেষণে গিরিগহ্বরে অতদূরে যাবার প্রয়োজন নেই, কাছেই আছেন রামকৃষ্ণদেব। অনন্তের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু জগতের ও জীবনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ

ছিল না। এই হেতু তাঁকেও সম্পূর্ণ মানুষ বলা চলে না,—তাঁকে মানুষ বলতে গেলে তাঁর ভক্তরা যে মারতে আসেন তা ঠিকই করেন! এই কারণে শ্রীঅরবিন্দকেও superman বলাই উচিত।

সম্পূর্ণ মানুষ তাঁকেই বলা যায় অনন্তের অনুচ্ছন্দে যাঁর অন্তর ও বহির্জীবন সঙ্গত; আত্মার ও আত্মপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যে যিনি রূপবান। শতদলের মতো জীবনের সবকটি দলেব সমবিকাশের সুষমা তাঁর, কোনো কিছুর অত্যগ্র আতিশয্য সেখানে নেই। খুব বড়ো কর্মী—কি খুব বড়ো জ্ঞানীকে মহাপুরুষ বলা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ বলতে পারিনে। দেহের আর সব অঙ্গকে ছাড়িয়ে মাথাটাই যদি বিরাট হয়ে ওঠে কিম্বা বাহুর পেশীই যদি অতি বেশী হয়ে দেখা দেয় তাকে আর যাই বলা যাক সুঠাম দেহ বলা যায় না। দেহ মন ও বুদ্ধি, কর্ম ও চেতনায় যাঁর সঙ্গতি সহজ, প্রকাশ সুসম আর সুন্দর, তিনিই সম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাই।

কিন্তু তা ব'লে রবীন্দ্রনাথ-ব্যক্তিটির মধ্যে art বা artificiality নেই এমন কথা আমি বলি না। তাঁর position-এর মূলে pose হয়ত অনেকখানি, তাঁর personality-র গোড়ায় purseএর সাহায্য প্রচুর। তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছুটা তাঁর হয়ে-ওঠা, কিছুটা ক'রে-ওঠা, কিছুটা লোকে তাঁকে বানিয়ে তুলেছে। তাঁর মধ্যে ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা, ছোট-খাটো ঈর্ষা-

দ্বেষ, লোভ এবং লালসা, ডিপ্লোমাসি বা ব্যবসাবুদ্ধি এসব-যে নেই তাও নয়; মানুষের জন্য বেদনা, দেশপ্রেম ইত্যাদি বড় বড় সদ্‌গুণের পাশাপাশি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তারা রয়েছে। এ সবই সত্য এবং এ-সমস্ত মিলিয়েই তিনি সম্পূর্ণ। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মতো এ-সবের উপরেই তিনি দাঁড়িয়ে, কিন্তু তবু তিনি সাধারণ নন এই জন্যে যে, দাঁড়িয়ে থেকেও এ-সবকে তিনি ছাড়িয়ে উঠেছেন—এমন কি, দেশপ্রেম এবং মানুষের জন্য বেদনাকেও।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমরা সামাজিক-মানুষটিকে সম্বর্ধনা করচি, সম্পূর্ণ মানুষটিকে নয়। কেন না, সম্পূর্ণ মানুষের মূল্য কি? যে মূল্যই তাঁকে আমরা দিই না কেন, অনন্তের যোগে তা তো শূন্যমান। ঘটা ক'রে মান-দণ্ডে সামাজিক মানুষের দাম বেঁধে দেয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষের কোনো দর নেই। কেবল যারা তাকে ভালোবাসে তাদের কাছেই তার আদর। এবং এই ভালোবাসা হচ্চে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার,—জনসাধারণের জয়ধ্বনির মধ্যে যার লেশমাত্র নেই।

অসংখ্য অবিকশিত ফুলের সমাধির পাশে একটি মাত্র ফুলকে ফুটতে দেখলে আনন্দ হয় না। এই যে অসম্পূর্ণ মানুষের দল যারা রবীন্দ্রনাথেরই মতো পূর্ণতার দাবী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল অথচ যারা সামাজিক ও মানসিক বাধার পায়ে ব্যর্থ হয়েচে, বিড়ম্বিত হয়েচে; চারিধারে জীবনের এই

যে বিপুল অপচয়, বিরাট অকৃতার্থতা,—এর পাশে একটি মানুষের সার্থকতার কোনো অর্থ হয়না,—তার জয়-নির্ঘোষে মানুষের পরাজয়-ঘোষণা। তাই রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমার আনন্দ নেই। আমার কাছে এ শোকাবহ ব্যাপার।

ক্ষুধার্ত কুকুরের কাছে রুটিই একমাত্র সত্য; বঞ্চিত মানুষ অনন্তকেও জানে না, জীবনকেও জানে না। মানুষকে শ্বত্ব থেকে তার স্বত্বে দাঁড় করাতে হলে যে-অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা তাকে সামান্য ক্ষুধায় অনুক্ষণ উদ্ব্যস্ত রেখেচে, তার অমৃতের আকাঙ্খায় ও জীবনের অঙ্গীকারে বাধা সৃষ্টি করচে, তাকেই দূর করতে হবে আগে। ক্ষুধার ধার দূর হলে, তারপরে তো সুধার স্বাদ।

মানুষ-যে সম্পূর্ণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথই তার প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষই সম্পূর্ণ হতে পারে অনন্তের যোগে ও জীবনের ভোগে। অনন্ত-ঐশ্বর্যে সবার সমান অধিকার, সেখানে কোনো পক্ষপাত নেই; কিন্তু কেবল অনন্ত-ঐশ্বর্যেই মানুষ কৃতার্থ নয়। জীবনের ঐশ্বর্যেও তার সমানাধিকার চাই, এমন কি, এইটাই সম্পূর্ণতার প্রথম ভাগ। পৃথিবীর মাটিতে শক্ত হয়ে যে দাঁড়িয়েছে সে-ই আকাশের দিকে তাকাতে পারে, চোরাবালিতে যে প্রতি মুহূর্তেই ডুবে যাচ্চে তার কাছে আকাশই বা কী, সূর্যই বা কোথায়?

যেসব মানুষ আজ রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করচে তাদের

দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের দিকে নেই ; নিজেদের দিকেও নেই, সম্ভবত তাদের দৃষ্টিশক্তিই নেই। তা যদি থাকতো তাহলে জয়োৎসবের বদলে দেশে আজ রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আসন্ন হোতো। একমাত্র সম্পূর্ণ মানুষের সম্বর্ধনার আয়োজন না হয়ে অসংখ্য অসম্পূর্ণ মানুষের পূর্ণতার পথ মুক্ত করার প্রয়োজন দাঁড়াতো।

ব্যক্তি-পর্ব থেকে এবার কর্মকাণ্ডে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিশিষ্ট কর্মসাধনা—তাঁর বিশ্বভারতী।

বিশ্বভারতী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। দেশের ও বিদেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থায় এর এমন কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই যাতে ক'রে এর অস্তিত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হতে পারে। এ-যুগের আর-সব University-র কাজ যেমন higher order of mediocrity সৃষ্টি করে পেটেন্ট মানুষের সংখ্যা বাড়ানো—বিশ্বভারতীরও ঠিক তাই নয় কি ?

কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য তো তা নয়। মানুষ দেহে, মনে, বুদ্ধিতে —অনন্তের ঐশ্বর্যে, জীবনের লীলায় আর বিলাসে নিজের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হবে—সেই সম্পূর্ণতার সাধনায় প্রেরণা ও সাহায্য দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে তপোবনের শিক্ষায় জীবনকে বাদ দিয়ে অনন্তের সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্যাম্'—এই ছিল তার মোদ্দা কথা। কিন্তু এ আদর্শ-এ

যুগে অচল, কেননা এ-যুগের মানুষ কেবল অমৃতত্ব চায় না, সে চায় সম্পূর্ণ হতে ; সে বলে—সম্পূর্ণই যদি না হলাম তো কী আর আমি হলাম !

সম্পূর্ণতা কী ? অনন্তের সঙ্গে এক হওয়া। কিন্তু এই এক হওয়ার অর্থ এ-যুগে আলাদা, তা যেমন স্বতন্ত্র,—তেমনি পরতন্ত্র। কেবল নিজেকে আর নিজের বিধাতাকে নিয়ে নয় বিধাতার সাথে সবাইকেই, সবকিছুকে নিয়ে। কামিনীকাঞ্চন বাদ দিয়ে না। বিশ্বলোকের প্রতি বিমুখ হয়ে অন্তর্লোকের দিকে উন্মুখতার নাম অনন্তের যোগসাধনা নয় আর। কেন না অন্তরের অন্তস্তলে যেমন অনন্ত আছেন, তেমনি রয়েছেন বাইরের জলে-স্থলেও, যেমন অতীন্দ্রিয়ে তেমনি ইন্দ্রিয়-গোচর জগতেও—কোথাও তাঁর বৈচিত্র্যের রহস্যের অন্ত নেই। এই দুই অনন্তকে নিজের স্ব-তন্ত্রে সম্মিলিত ক'রে মানুষ যেমন সম্পূর্ণ, দ্বিধাগ্রস্ত এই অনন্তও মানুষের অস্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে আত্মসম্ভোগের অনুভূতিতে সেইরূপ চরিতার্থ।

এ-যুগে সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যার সাহায্যে অনন্তের সঙ্গে একাত্মীয়তা মানুষের পক্ষে সহজ হবে, আপনার অন্দরের চাবি তার হাতে আসবে ; সেইসঙ্গে বাইরের মালখানারো—জীবনের ভালোমন্দের ভেতর দিয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসদ্ থেকে জীবনকে সত্যরূপে স্বী-করণের ক্ষমতা তার হবে। কেবল অমৃতের অধিকারই তো তার নয়, আজকের জীবন-

মন্থনে অমৃতের সঙ্গে যে হলাহল অবশ্যম্ভাবী তারও অধিকার তার,—সেই হলাহলকে system-এর মধ্যে সমীকরণের (neutralise করার) শক্তি যোগানোও আধুনিক শিক্ষার একটা বড় কথা। এই ধরণের কোনো শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্মে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা নয়।

জানার দুটো উপায় আছে,—অন্তর থেকে জানা আর বই প'ড়ে জানা। বই-এর ভেতর দিয়ে অপরের চিন্তার ফল বা উপলব্ধির কথা আমাদের গোচরে আসে, কিন্তু কেবল বই প'ড়ে গেলেই সেই ফল পাবার কথা নয়। যতক্ষণ না অপরের জ্ঞান স্বকীয় অনুভূতিতে সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়েছে ততক্ষণ তা আদৌ স্বী-কৃত নয়, তখন তা নিতান্তই পুঁথিগত, ব্যর্থ এবং বিড়ম্বনা—কেননা সে-জ্ঞান শক্তিও দেয় না, সংস্কৃতিও দেয় না। সংস্কৃতি-দান ও কৃষ্টির প্রসার ঘটানো শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু এ-আদর্শ গত যুগের—সম্ভবত বিশ্বভারতী সেই পুরোণো পথেই পরিচালিত হয়। এই কৃষ্টি-লাভকেও সহজ করার কোনো নতুন কৌশলও রবীন্দ্রনাথ বের করতে পারেন নি।

তবে বিশ্বভারতীর দরকার? মানুষকে ট্রেন করা একটা মিথ্যা কাজ, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এ-কথা জানেন। মানুষ কিছু ট্রেন নয় যে লাইন বেঁধে তাকে ইচ্ছামতো চালানো যাবে—তাকে ট্রেন করা মানেই তার পয়মাল্—তাকে মালগাড়ি করা।

মানুষ হচ্ছে এমন বস্তু যা নিজে চললেই চলে, চালাতে গেলে সে অচল। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এবং অনুরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যাপার আছে, তবে সে সব Lesser Brain-এর কেরামতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ যখন সঙ্ঘ গড়েন তখন মনে হয়, এ সাঙ্ঘাতিক। এ দুর্বিপাক—তাঁদের পক্ষেও যেমন, তাঁদের আওতার মধ্যে যারা—তাদের পক্ষেও তেমনি। কেননা মানুষ নিজের ভেতর থেকে হয়ে ওঠে, তাকে ক'রে তোলা যায় না; ক'রে তুলতে গেলেই সে আর যাই হোক মানুষ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী তবে কিসের জন্য? প্রোজ্জ্বলিত তাঁর ব্যক্তিত্বের ইন্ধন যোগাবার জন্যেই, যাতে নিজের কাছে ও পরের কাছে নিয়ত তিনি দৃশ্যমান থাকেন। এই শিক্ষা-সংঘটনের উপলক্ষ্যে যে-সব নরনারী সেখানে জড়ো হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা সমিধের মতই জরুরি। বিরাট বনস্পতির মতো রবীন্দ্রনাথ হয়তো এ-কথা মনে করেন যে তাঁকে রস যোগানোই হচ্ছে নিচের মাটির একমাত্র কাজ এবং নিচের মাটিও মূঢ়তাবশে ভাবতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের বনস্পতিত্বেই তাদের সার্থকতা—কিন্তু তাতে মানুষের ও মানুষের মধ্যে যে-সত্য-সম্বন্ধ তার অস্বীকার। মানুষকে রসদরূপে ব্যবহার করা রসচর্চার একটা বড়ো অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু এই রস-নিষ্কাষণের ব্যাপারে মানুষকে নিতান্তই মাটি করা হয়।

বিশ্বভারতী মৌলিক শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবনাগার নয়, কোনো নতুন শিক্ষাপ্রণালীর পীঠস্থানও না,—সঙ্ঘ-হিসেবেও এর যা সার্থকতা তা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিরাট এক অপকর্ম।

রবীন্দ্রনাথের সত্যকারের প্রকাশ তাঁর কর্মে নয়, তাঁর সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পূর্ণতার সাহিত্য।

তার অর্থ এ নয় যে, 'সম্পূর্ণ হও সম্পূর্ণ হও'—রবীন্দ্র-সাহিত্যের আগাগোড়া উচ্চৈস্বরে কেবল এই বাণী। তাঁর সাহিত্য-স্রোতস্বতী যখন পাঠকের মনের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তখনি সে নিজের মনে মনে হয়ে যায়। তখনি অলক্ষ্যে, তার নিজেরা অগোচরে, ভাব, চিন্তা ও প্রেরণার পলি পড়তে থাকে, পলে পলে যা হয়ে হয়ে—তার চিত্তলোকে, তার অবচেতনায় আরেক উপাদান জমায়—নতুন ফসল ফলাবার জন্যই যে-জমি। তলে তলে তার জীবনের রূপান্তর ঘটে, যার ফলে তার কর্মধারায় ও লোকযাত্রায় অপরূপায়ন ঘটতে থাকে ; সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

অবশ্য, সাহিত্য-সম্পর্কেই সাধারণত একথা খাটে, কেননা যথার্থ সাহিত্য-মাত্রই সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। স্বচ্ছন্দ আত্মসৃষ্টি এবং আত্মসম্ভোগের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পথে যে-সব রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আছে তা দূর করতে

পারে কেবল বিপ্লব—কিন্তু মানসিক বাধা দূর করতে সাহিত্যই একমাত্র; শুধু বাধা দূর করাই নয়, পূর্ণতার পথনির্দেশও সে দেয়। সাহিত্য-মাত্রেরই এ-ই কাজ, তবু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পূর্ণতার সাহিত্য বিশেষ ক'রে এই জন্য যে, অনন্ত নিজগুণে এই সাহিত্যে এসে ধরা দিয়েছেন; এর ঐশ্বর্য, এর প্রাচুর্য, এর প্রকাশ বৈচিত্র,—এর ঋদ্ধি আর সমৃদ্ধি—এর রূপের ও রসের বিস্তার—সব-নিয়ে বিচার করলে এ-কথা না মেনে উপায় নেই।

কিন্তু এই যে আজ জয়ন্তী-উৎসবে এত অগণ্য গণ্যমান্য লোক জমায়েত হয়েছেন এঁরা কি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকে যথার্থরূপে বুঝেছেন এবং গ্রহণ করেছেন? আদপেই না। কেননা সেকথা সত্য হলে আজ চারিদিকে জীবনের জয়ন্তী দেখা দিতো। এঁদের ঐক্যতান জয়ধ্বনির নেপথ্য-ভাবখানা এই: এই চমৎকার ব্যক্তিটি এতদিন বেঁচে আছেন, ইনি-আবার নোবেল-প্রাইজও পেয়েছেন, নানাদেশে রাজোচিত সম্মান লাভ করেছেন (বলা বাহুল্য বিদেশেও ববীন্দ্রনাথ সেই সব মানুষের সম্মান পেয়েছেন যারা এঁদেরই মতো তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যকে বোঝেওনি, গ্রহণও করেনি। খালি তাঁর খ্যাতির দিকে তাকিয়ে খাতির করেছে।) অতএব এসো, আমরা সকলে মিলে "রবীন্দ্রনাথ কি জয়" বলে চেঁচিয়ে এঁকে একটু খুসি ক'রে দিই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বোঝা এবং ক্ষুদ্র হয়ে খর্ব হয়ে থাকা— এ দুটো এক সঙ্গে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে যে বরণ করেচে সে কোনো কারণেই জীবনকে ক্ষুদ্র করতে পারে না, কোনো বন্ধনকেই স্বীকার করতে পারে না—অপরকে বাঁধবার ও নিজেকে বাঁধা রাখার প্রাত্যহিক আত্মহত্যায় সে অক্ষম। আর-সবাইকে ছেড়ে দিয়ে কেবল সাহিত্যিকদেরই ধরা যাক্ ; তাঁদের বিশেষ অহমিকা যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বোঝেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে, তাঁদের ভেতরে যাঁরা অসাধারণ, এমন কি সম্রাটতুল্য তাঁদের মধ্যেও, জীবনের ও মনের যে-দৈন্য আমি দেখেচি তাতে আমি ভাবতে পারিনে রবীন্দ্রনাথকে পড়ার ফলে তাঁকে প্রকৃত-রূপে অঙ্গীকার করতে তাঁরা পেরেছেন বা কোনোদিন পারবেন।

এই অস্বাভাবিক যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। একদিকে প্রাচুর্যের বাড়াবাড়ি অন্যদিকে অভাবের পীড়াপীড়ি ; একদিকে পাণ্ডিত্যের অভ্রভেদ, আরেক দিকে নিরক্ষরতার অজ্ঞানতার অতলান্ত ; মধ্যিখানে নৈবেদ্যের চূড়ায় মণ্ডার মত মুখ্যরা, আর তার চারপাশে মুখ্যুরা—এই প্রচণ্ড আতিশয্যের মাঝে কল্পতরুও ফলপ্রসূ হতে পারে না। বৈষম্যের এই উঁচুনিচু থেকে কোনোদিন যদি সমস্ত মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতলে আনা সম্ভব হয়, সম্পূর্ণতার বীজ কেবল তখনই অঙ্কুরিত হতে পারে ; রবীন্দ্র-সাহিত্য সেই যুগের— সেই কালের।

সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক

যে-প্রকারেই হোক, এই পৃথিবীতে যাঁরা কর্তৃবাচ্য হয়ে উঠেচেন তাঁদের জয়ধ্বজা ধরা—এক কথায় সুরেশবাবুর প্রবন্ধ।* তা, সুরেশবাবু যত খুসি ধ্বজা ধরুন আমার আপত্তি নেই, তবে কথা এই, এই কর্তা-ভজার দেশে তাঁর এই মনোভাবের সংক্রামক হয়ে পড়ার ভয় আছে। আসলে এই মনোভাব হচ্ছে, মনের অভাব—এত রকমের দারিদ্র্যের সঙ্গে যদি মনের দৈন্য এসে জোটে, ভক্তিভার আমাদের কাঁধে ভর করে, তাহলে সেই ভূতের বোঝা সত্যিই মারাত্মক হয়ে উঠবে। পাস্ট্ ডিজেনারেশনের আশা আমরা ছেড়েই দিয়েচি, তাঁরা বিশ্বভারতী, বেলুড়মঠ বা অরবিন্দ-আশ্রমের পরিশিষ্ট হয়ে বাকী ক দিন বেশ ফূর্তিতে কাটিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু এ-যুগের ছেলেমেয়েদের বিশিষ্ট হতে হবে, ব্যক্ত হতে হবে, সম্পূর্ণ হতে হবে। এবং তা হতে হলে তার গোড়ার কথাই হচ্ছে কর্তাকে না মানা। কর্তার অনুসরণে অবশ্যি বাজার-দর বাড়ানোর সুযোগ-আছে, কিন্তু আত্মবিকাশের পথে কর্তৃবাচ্য নেই, সেখানে মহাজনের পথে নয়, সর্বজনের সহযাত্রায় নিজের পথে চলা—সে হচ্ছে সার্বজনীন ভাববাচ্য আর কর্মবাচ্য।

এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই Capital I হয়ে ওঠা চাই। এতদিন ধ'রে Capital HE-র ভরসা করেছি আমরা—তস্মিন্

* নবশক্তি—৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় হসন্তের পত্র—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—কিন্তু দেখা গেল সে-ভবী কস্মিন্ কালেও ভুলবার নন্। পরমাত্মার খুদে অংশীদার মহাত্মাদেরও বাজিয়ে দেখা গেল, সবাই তথৈবচ! অতএব এখন খোদ-কর্তা বা কর্তা-খোদাকে ছেড়ে খোদার ওপর খোদ্‌কারি-কর্তা হতে হবে। বেয়ে চেয়ে দেখতে হবে নিজেরই মধ্যে কোনো মূলধন আছে কিনা। এবং এই Capital I-এর আত্মবোধকে বাড়াতে হবে Communistic I এর ভেতর দিয়ে—সকলের জন্য আমি আর আমার জন্য সবাই—এই সর্বগ্রাসী আত্মচেতনার ভেতর দিয়ে।

অবশ্য "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—আহা, আমিই সেই ব্রহ্ম"—এই ভাব-বিলাসিতার সাহায্যে মামুলি আত্মবোধের পদ্ধতি এখনো এদেশে বাতিল হয় নি, কিন্তু এই ভাবে আত্মেচেতনার প্রসার যে কতদূর কাঁচা তা নামজাদা সোহংস্বামীদের ল্যাজ চুলকে দেওয়ামাত্রই টের পাওয়া যায়। তাঁদের প্রিভিলেজে পা দিলে আর রক্ষে নেই! কিন্তু সে-কথা থাক, ব্রহ্মের জ্ঞান এবং তস্য শক্তি লাভ করেচেন ব'লে শোনা গেছে, নৈমিষারণ্যের যুগ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত, এবং হিমালয়ের গুহাচারী থেকে পণ্ডিচারী অবধি-এমন বহুৎ আছেন—কিন্তু তবু এ দেশের ঘাড় থেকে ভূত নামে না কেন? ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই কেন? কেন? যাঁরা স্পিরিচুয়াল আত্মবোধ লাভ করেচেন তাঁরা আত্মশক্তির দ্বারা সংসারের কোন্ সমস্যাটা

সমাধান করতে এগিয়েচেন ? শ্রীঅরবিন্দ কি তাঁর স্পিরিচুয়াল্ শক্তি দিয়ে একজনও সাধারণ মানুষকে মেটিরিয়ালি সহায়তা করতে প্রস্তুত ? কখনই নন্, একথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি, কেননা তাতে তাঁর ব্যক্তিগত পুঁজিতে হাত পড়ে। (আর টাকা-জিনিসটা পুঁজের মত হলেও পূজ্য।) সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির Capital I-এর বোধকে জাগ্রত ক'রে Socialistic I-এ দাঁড় করানো ছাড়া আজকের এই সার্বজনীন দুঃখের প্রতিকার নেই। এছাড়া কোনো সমাধান হবার নয়। অর্থ-নীতির capital-কে যেমন সকলের সেবায় society-র মধ্যে চারিয়ে দিতে হবে, তেমনি আত্মবোধ ও আত্মশক্তির capital-কেও। নিজ্-অন্ত প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে পরিণতি পেলেই সেই সার্থকতা। সেই প্রকরণেই সকল দ্বন্দ্বসমাসের সমাধান।

যাঁরা ব্রহ্মের ভাবে কাতর আর ভারে কাহিল সেই সব ব্রহ্মাতুরদের দিয়ে পৃথিবীর কোনো উপকার হ'বে না, কেননা তাঁরা আবার সমস্ত বোঝা ব্রহ্মের ঘাড়ে চাপিয়ে ব'সে আছেন,—তিনি যা করবেন তাই হবে, এই তাঁদের আইডিয়া। তার মানে, সেখানে আবার আর একটা বড়ো রকমের কর্তৃবাচ্য—বাবার বাবা-ism ; আমরা ভরসা করছি মহাত্মার, মহাত্মার ভরসা Inner Voice ; কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হবে, কিন্তু খোদ্ বিশ্বকর্মা একজন নামজাদা অকর্মা। ইতিহাসের নজির এই

যে, ভগবানের দ্বারা কখনো কিছু হবার নয়, বিশেষ ক'রে মানুষের কোনো ভালো। লেনিন যদি নিজের হাতে না নিয়ে ভগবানের ঘাড়ে কাজের ভার চাপিয়ে দিতেন তাহলে রাশিয়ার প্রলিটারিয়েটদের দুঃখ-দুর্দশা দূর হতে আরো ক-যুগ লাগতো কে জানে!

এটা সত্য যে আমাদের শক্তি, প্রেম ও সৌন্দর্যের অফুরন্ত উৎস অনন্ত থেকেই। কিন্তু এই অনন্ত নির্বিকার—সমুদ্র যেমন, আমি তার জলে ঘটি ভরতেও পারি, নাও পারি। সমুদ্রের নিজের কোনো গবজ নেই, ঘটি ভরতে হলে আমাকেই এগুতে হবে। এই অনন্ত উৎসকে exploit করার উপায় পণ্ডিচেরির মতো ঊর্ধ্বলোকের দিকে হাঁ ক'রে থাকা নয়,—তা যদি হোতো, তাহলে এতদিন হাঁ ক'রে থাকার ফলে শ্রীঅরবিন্দ যে ভগবদ্‌শক্তি হজম্ করেছেন তাই দিয়ে আজকের জগৎ-সমাজে বিপ্লব ঘটিয়ে আমাদের হাঁ করিয়ে দিতেন! আকাশে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু তার আলো ও শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে, আকাশের দিকে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকলে চলে না, সেই তড়িত প্রবাহকে যথারীতি চালাতে হয়। নইলে খালি-খালি তড়িৎমন্ত্র জপ করে শুধু প্রতারিত হতে পারি। উপবাস বা উপাসনায় বিদ্যুতের মন গলে না,—তার প্রভু হয়ে তাকে সেবায় লাগালেই সে জব্দ হয়। তেমনি অনন্তও,—আমারই ইচ্ছার বশে শক্তি এবং প্রেরণা যোগাতে সে বাধ্য; আমার

এই-ইচ্ছাকে পূর্ণরূপে জাগ্রত ও প্রসারিত করার মানেই হচ্ছে I-এর capital বাড়ানো, অন্য কথায় Capital I হয়ে দাঁড়ানো।

এ বোঝা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। ভগবানের ইচ্ছায় যুগ-যুগান্ত ধ'রে রাশিয়ার নরনারী নানা প্রকারে নিপীড়িত হয়েছে, কিন্তু Capital I লেনিন যখন বলল, না, এ রকম আর চলবে না, আমি এটা অন্য রকম ইচ্ছা করি, অমনি সেখানে ইতিহাসের চেহারা বদলে গেল। লেনিনের মত্‌লবে ভববান তাঁর মত বদ্‌লাতে বাধ্য হলেন।

অতএব দাঁড়াচ্ছে এই, 'ত্বয়া হৃষিকেশহৃদিস্থিতেন' ভাব নিয়ে অর্দ্ধবাহ্য দশায় বসে থাকলে না-ঘুচবে নিজের দুঃখ, না-সংসারের; ভগবানের দাস হয়ে নয়, ভগবানকে দাস করতে পারলেই সেটা সম্ভব। আসলে অন্তর্গত অনন্তকেই ইচ্ছামত exploit করার উপায় আবিষ্কারের উপরই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু ভগবৎশক্তি পেতে হলে ভগবানের ধামা ধ'রে তা হবে না। তা সম্ভব ভগবানকে বাড়িয়ে নয়, খাটো করেও না,—ভগবানকে খাটিয়ে। যেমন, সুরেশ বাবু বলেছেন।

> "অন্নের পূজায় অন্ন মিলবে না, অন্ন-জগতের চাইতে উঁচু একটা জগতের অর্থাৎ প্রাণ-জগতের পূজায় তা মিলবে; আবার প্রাণ-জগতকেও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রাণ-জগতের চাইতে উচ্চতর জগতে যেতে হবে"।

—তেমনি ভাগবত শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে ভগবানের পূজায় তা হবে না, ভগবানের ওপরে যেতে হবে। মানুষের শিল্পে, সভ্যতায় ও লোকযাত্রায় যা-কিছু উত্তম সবই হচ্ছে খোদার উপর খোদ্‌কারি। সুরেশবাবুর কাছে হয়ত এসব ধাঁধাঁর মতো মনে হচ্ছে, কিম্বা হয়ত তিনি এতক্ষণে কানে হাত দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ-জপতে সুরু করেছেন!

কিন্তু এটা যদি তাঁর কাছে ধাঁধাঁর মতো না ঠেকে থাকে এবং শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীভগবানকে ডিঙিয়ে ভাববার দুঃসাহস তাঁর থেকে থাকে তাহ'লে তিনি বুঝতে পারবেন, রাশিয়া কেন ভগবান আর ধর্মকে বাতিল করল। এতদিন ধ'রে ভগবানের মার ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে কিনা! মানুষের দুঃখ দূর করতে যখন মানুষ ছাড়া কেউ নেই, তখন ব্যক্তির Capital I-কে জাগানো ছাড়া উপায় কি?—মানুষের অহংকারই হচ্ছে মানুষের সভ্যতা, মানুষের শিল্পসাহিত্য, মানুষের নিত্য নব সৃষ্টির প্রেরণা! কিন্তু এই অহংকারও দুর্বিপাক আনে, যদি তা অন্যের আমিত্বের ঘাড়ে গিয়ে চাপে। তাই এই Capital I-এর দুর্গতি দূর করতে চাই তার তদ্ধিত প্রত্যয়, আর সেই-খানেই আসে সোস্যালিজম্।

আধ্যাত্মিক কৌশলে ব্রহ্মের যোগে Capital I বাড়ানোর যে অন্তর-গত উপায় আছে, নির্বিশেষ সকলের মধ্যে সেই নিজ-অস্ত প্রত্যয় প্রসারিত না হলেই মারাত্মক; যেমন এদেশে এমন

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু আছেন যিনি ব্যবহারিক জগতে দস্তুরমতো অর্থ-পিশাচ, এমন রাজর্ষি আছেন প্রজা-শোষণে যাঁর বাধে না, এমন ব্রহ্মবিদ্ আছেন যাঁর কেবল ভূমাতেই সুখ নেই—ভূমিতেও ভুখ্; এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি ব্রহ্মলোকে বাস ক'রেও তৃপ্ত নন্, নিজের আশে-পাশে তাঁকে গো-লোক তৈরি করতে হয়েছে। অতএব ব্রহ্মযোগে Capital I-এর যে-শোধন কিম্বা বোধন-পদ্ধতি সেটা পাকা রকমের নয়, তাতে রঙ্ ধরে মাত্র, কিন্তু জিনিসটা right হয় না ব'লে ধোপে টেঁকে না। এই জন্যই কমিউনিজ্মের অপেক্ষা ছিল—এত যুগের অধ্যাত্মবাদে যা পারেনি এতদিনে সাম্যবাদে তাই পারলো, মানুষের অহং-বোধকে নির্বিষ এবং নির্বারিত ক'রে—Capital I-এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে Capital we-এ। সত্য এবং কল্যাণ-বোধের অন্তর-গতিই যথেষ্ট নয়, বাহিরের লোকযাত্রায় বহির্গতিতেই তার পরীক্ষা।

সুরেশ বাবুর Capital I-এর প্রতি কটাক্ষপাতের জবাব দিতেই এতক্ষণ গেল, এইবার তাঁর আসল কথায় আসবো। রবীন্দ্র-জয়ন্তী ব্যাপারে আমি গত বছরে যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সুরেশ বাবুর 'হসন্তের পত্র' হচ্ছে তারই প্রতিবাদ। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ্য বা প্রতিপাদ্য যাই হোক না, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে defend করা। কোন্ রবীন্দ্রনাথকে? না, কবি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু আসলে, আমার মূল প্রবন্ধে

কবি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ ছিল না, যা ছিল তা বিশ্বভারতীর কর্তার উদ্দেশে। কাব্যের রবীন্দ্রনাথ আমার বিস্ময়, আমার যা-কিছু আক্রমণ তা ছিল সঙ্ঘের রবীন্দ্রনাথের—অর্থাৎ সঙ্ঘবাদের বিরুদ্ধে; কিন্তু সুরেশ বাবু পাকা লোক, ভুয়োদর্শন হয়েছে তাঁর; অর্থাৎ তিনি যা দেখেন সমস্তই ভুয়ো অথবা তিনি দেখেন ঠিকই, দেখাতে বা বোঝাতে চান অন্যরকম—অর্থাৎ যেমন তাঁর ভুয়ো-দর্শন, তেম্‌নি ভুয়োপ্রদর্শন। তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর এই নবতম রচনার কেরামতিতে—তিনি সঙ্ঘের রবীন্দ্রনাথকে defend করেছেন কাব্যের রবীন্দ্রনাথকে খাড়া ক'রে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সঙ্ঘবাদের কোনো defence আছে না কি? এ হেন capital eye না হলে আর সুরেশ বাবুর কপালে এমন capital woe ঘটে!

কাব্যের রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্ঘের রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ও BIG রবীন্দ্রনাথ—দুটো একেবারে আলাদা, এটা সুরেশ বাবু বুঝতে চেষ্টা করুন; চেষ্টা করলে এটা তাঁর কাছে ততটা হেঁয়ালী নাও ঠেকতে পারে। অনন্তের যোগে মানুষ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়া আর BIG হওয়া এক নয়,—বড়ো হতে হলে অসংখ্যের যোগাযোগ চাই। আত্মসাক্ষাৎ ক'রে মানুষ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু বড়ো হতে থাকে আত্মসাৎ ক'রে। অনন্ত প্লাস্‌ রবীন্দ্রনাথ প্লাস্‌ তাঁর প্রকাশ—

রবীন্দ্রনাথের কবি হওয়ার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট, কিন্তু এ-সমস্ত মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ একক, একাকী, শুধু একমাত্র। কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথ বড়ো হতে চেয়েছেন সেখানে তাঁকে আরো ব্যক্তি সংগ্রহ ক'রে সঙ্ঘ গড়তে হয়েছে এবং তাঁর একমাত্রার মূল্য বাড়ানোর জন্যে আর সবাইকে শূন্য-মাত্রে পরিণত করতে হয়েছে ; অনন্তের যোগে মানুষ সম্পূর্ণ এবং একতম, কিন্তু সেই একতমের যদি বাজার-দর বাড়ানোর গরজ থাকে তাহলে শূন্যতমদের যোগাড়ে লাগতে হয়—কেননা একের আপেক্ষিক মূল্য শূন্য-বৃদ্ধিতেই বাড়ে। কবি যখন "অনন্তের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে" অব্যক্তের যোগে অনির্বচনীয়, তখন তিনি নিরাপদ ; কিন্তু তখনই ভয়াবহ যখন "নাল্পে সুখমস্তি" ব'লে তিনি ভূম্যধিকারী হতে বেরোন। বিশ্বের ধনযোগে ও জনযোগে সকলের চেয়ে বড়ো হবার বাসনা তাঁকে পেয়ে বসে। কেবল কবি হয়ে তখন তাঁর তৃপ্তি নেই, কবির আসন থেকে তিনি নেমেছেন ; রাজার সিংহাসনে ও রাজদণ্ডে তাঁর লোভ। এবং আজকের সাম্যবাদের যুগে আর-সব রাজার ভাগ্যে যে-দণ্ড লাভ হয়েছে তাঁরও বরাতে তখন তা-ই—জগন্নাথের যে-দুর্গতি, বলরামেরও ততদূর গতি। কেননা, তখন তিনি কেবলমাত্র capital-I নন্, রীতিমত capitalist—I-ই সুতরাং যে-দণ্ড তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য, তাও capital হতেই বাধ্য। ক্যাপিটাল পানিশ্‌মেণ্টই।

বিশিষ্ট ব্যক্তি যেখানে নিজের মধ্যে সংহত সেখানে তাঁর আদর-মাত্র, কিন্তু যেখানে তিনি সঙ্ঘগত কেবল সেইখানেই তাঁর বাজার দর। অবশ্যি এই দর বাড়ানোর গরজ তাঁর একার নাও হতে পারে। সেখানে হয়ত এটা দুদিকেরই চাহিদা। Unit-এর যেমন শূন্য চাই, শূন্যদেরও তেমনি unit-কে দরকার— উভয়ের দাম বাড়াতে উভয়েরই কদর। কিন্তু তখন এই প্রশ্ন আসে যে বস্তুতঃ ওরা শূন্য ব'লেই কি unit-কে চায়, না, unit-কে আশ্রয় ক'রেই ওরা শূন্যে দাঁড়ায় ;—অনেকটা "তাল পড়িয়া ঢিপ করে কি ঢিপ করিয়া তাল পড়ে"-কূট তর্কের মত। কিন্তু নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত তার যাই হোক, তাদের বর্তমান শূন্যাকার দেখে তারা-যে শূন্যমাত্র এবং সঙ্ঘবাদের পরিণত-ফল তার প্রমাণ পেতে দেরি হয় না। তবে এই শূন্যমাত্রদেরও একটা বাহাদুরি আছে যেটা তাদের বাজার-দরের মূলে—তা' হচ্ছে unit-এর সঙ্গে ঠিকমতো নিজেদের খাপ খাওয়ানোতে। শূন্যরা ১-এর ডানদিকে বসলেই—নিজের বাড়ন্ত শক্তি দিয়েও—তার গুরুত্ব বাড়ায় ; কিন্তু তারা বাঁদিকে বেঁকে দাঁড়ালেই গোলযোগ, কেননা তাহলে আর unity থাকে না, এমন কি unit-এরও তখন মূল নিয়ে মূল্য নিয়ে টানাটানি—দস্তুরমত মান-হানির দশা। সেটা একটা নিতান্তই decimal এবং dismal ব্যাপার !

সুরেশ বাবু চেঙ্গিস খাঁ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনা ক'রে দুজনের ভয়ানক পার্থক্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু

পার্থক্য যা-কিছু তা ডালপালায় এবং ফুলে-ফলে। মূলতঃ কোনো মানুষের সঙ্গেই কোনো মানুষের বিভেদ নেই। উচ্চতম থেকে নীচতম, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, যতোরকমের মানসিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যেও সম্ভব, তা তথাকথিত বড়োদের মধ্যেও যেমন ছোটদের মধ্যেও তেমনি,—রূপের এবং ক্রমেরই যা-কিছু ব্যতিক্রম। চেঙ্গিস খাঁর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ছিল—তা বিকাশলাভ করেনি; এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও চেঙ্গিস আছে—তিনি তার ভোল্ ফিরিয়ে নিয়েছেন। সত্যি বলতে, রবীন্দ্রনাথ ও চেঙ্গিস খাঁ সকলের মধ্যেই বিরাজমান, প্রকাশের ও পরাক্রমের যে-বিভিন্নতা দেখি তা মিশ্রন-ক্রমের তারতম্যে। আসলে সব মানুষের মধ্যেই আছে সব মানুষ—আদতে সবারই এক আত্মা কিনা, সেইজন্যই বোধহয়।

অবশ্যি, সহজ দৃষ্টিতে চেঙ্গিস খাঁর সঙ্গে এ-যুগের BIG মানুষের মস্ত একটা তফাৎ দেখা যায়, তা এই, চেঙ্গিসের bigness-এর মূলে ছিল অসংখ্যের বিয়োগ—আর এঁর বেলা অসংখ্যের যোগ। কিন্তু এ-তফাৎ সামান্যই, সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে এই যোগ-বিয়োগের রহস্য অতীব স্পষ্ট—কেননা, চেঙ্গিসের হাতে যাদের প্রাণবিয়োগ হোতো, এখনকার এঁর হাতে তাদের আত্মবিলোপ হয়; চেঙ্গিস যাদের মৃত্যুসাৎ ক'রে নিস্তার দিতেন ইনি তাদের আত্মসাৎ ক'রেও নিষ্কৃতি দেন না। যাদের ইনি অঙ্গীকার করেন কেবল তাদেরই ইনি স্বীকার করেন,

স্বীকৃতদের আনন্দের সীমা থাকে না, আর এইখানেই এঁর বাহাদুরি, যেহেতু তাদের ইনি বুঝতেও দেন না যে আসলে ইনি তাদের শিকার করেন। এঁর spell-এ manslaughter man's laughter হয়ে ওঠে। চেঙ্গিস খাঁ সরল এবং কঠিন ; ইনি মিষ্টিক, সেই কারণেই মিষ্টি ; চেঙ্গিসের ছিল বলপ্রয়োগ, এঁর হচ্ছে ছলপ্রয়োগ—মারাত্মকতার প্রয়োগনৈপুণ্য এঁরই বেশি। চেঙ্গিস হত্যা করতো, বল্‌তো, Ideal ; ইনি হত্যা করেন, বলেন—I deal ! আর নিহতরাও সেই কথায় সায় দেয়। ভেবে দেখুন, সেদিনের থেকে বিশ্ব সভ্যতা একটুখানি এগিয়েচে তো, সুতরাং হত্যারও একটা মুখরোচক সভ্য সংস্করণ হবে নাকি ? চেঙ্গিসের আমলে যে-দাওয়াই ছিল crude, তেতো, একটা য়্যালোপ্যাথিক ব্যাপার—এখন তার হোমিওপ্যাথিক ডোজেই কাজ দেয়, স্পিরিটের মধ্যে ডাইলিউ-শন হয় ব'লে এ বরং আরো বেশি এফেক্‌টিভ !

সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক। সঙ্ঘের যিনি কেন্দ্রমূল তিনি 'ঘ'—ঘ-এ ঘুঘু। বাঁকী সবাই সঙ্‌। সঙ্‌দের নিয়ে যাঁর আরাম তিনিই সঙ্ঘারাম, তাঁর কর্মই হচ্ছে সঙ্ঘীয়দের আত্মার আ-কার লোপ ক'রে দেওয়া ; তার ফলে পুরুষরা পরিণত হয় হসন্তে এবং মেয়েরা খণ্ড-ৎ-য়ে। পদাশ্রিত চিহ্নমাত্র-অবশেষ চেহারা দেখলেই পুরুষদের চেনা যায়, মেয়েদের চিনতে হলে কালীয়দমনের পট স্মরণ করতে হবে,—সেখানে শ্রীকৃষ্ণ যেসব

যুক্তকর অর্ধ-নারীর ঈশ্বররূপে বিরাজমান তাঁরাই আধুনিক খণ্ডিতাদের পৌরাণিক রূপ।

কেউ যদি নিজেকেই দোহনের লক্ষ্য করেন তাতে কোনো দুঃখ হয়না, কিন্তু তিনি অপরকে উপলক্ষ্য করলেই বিপদ; অনন্তের ঐশ্বর্য যত খুসী তিনি লুঠ করুন আপত্তি কার, কিন্তু অপরের দিকে নজর দিলেই বিপত্তি; নিজে আত্মস্থ হোন্—সুখের কথাই; কিন্তু আর সবাইকে উদরস্থ করতে চাইলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি—কেননা মানুষ-যম যখন আর-সকলের ব্যক্তিত্বকে হজম ক'রে ক্রমেই মহামানব হতে থাকেন তখন রাহুগ্রস্ত সে-বেচারাদের আধা-আত্মায় পরিণত হতে হয়। সেই সব হাফ্-সোলের তখন তাঁর জুতোর তলায় পরিণত হওয়া ছাড়া গতি থাকে না। কর্তার জুতোয় ছাড়া হাফ্‌সোল্ আর দুনিয়ার কোন্ কাজে লাগে? নতুন অবস্থায় যখন কিছু পদার্থ থাকে তখন তার মচমচে আওয়াজ—সেটা কর্তার এবং কর্তৃত্বের পক্ষে তার কীর্তন; পুরাণো অবস্থায় বুলি অন্য রকমের, তখন সে কাদা ছিটোয় এবং কর্তার পতনে সাহায্য করে—কিন্তু যাই সে করুক, তার সারা জীবন বিরাট একটা বিরাম-চিহ্ন। তার ধারণা যে সে চলে, কিন্তু তার গতিও নেই বৃদ্ধিও নেই—তবে ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে, কেননা কর্তার চলা হয় আর তার তলা ক্ষয়। ট্রাজেডি এই যে, সেই শূন্য-মাত্রার গর্বে সুরেশবাবুর হাসি ধরে না, কিন্তু তাঁর হসন্ত-রূপের কারুণ্যে আর কারু হাসি পাবার কথা নয়।

সঙ্ঘবাদের বিরুদ্ধে আমার যে-অভিযোগ তা কোনো বিশেষ সঙ্ঘের উদ্দেশে নয়, বা কোনো সঙ্ঘকে বাদ দিয়েও না। যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হোক্, কোনো হুজমশক্তিওয়ালা লোক কেন্দ্র ক'রে যেখানেই সঙ্ঘ গ'ড়ে উঠেছে সেখানেই এই দশা; সেইখানেই বিশিষ্ট ও পরিশিষ্টের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, গুরুভারে শিষ্যদের সহজ আত্মবিকাশ রুদ্ধ। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তো আসলে খাদ্যখাদক—অনেকটা গরু ও শস্যের মধ্যে যে-সম্পর্ক।

কেউ কেউ হয়ত পণ্ডিচারী-জাতীয় সঙ্ঘের সমর্থনে বলতে আসবেন যে, এখানে উচ্চতর সত্যের আরাধনা হয়ে থাকে, এ হোলো দার্শনিক বীক্ষণাগার, প্রয়োজন ছিল এর। কিন্তু সে-প্রয়োজন কার? শ্রীঅরবিন্দ ও সুরেশবাবু প্রভৃতির প্রয়োজন বল্‌লে অর্থটা বোঝা যায়—কিন্তু মানবজাতির প্রয়োজন বল্‌লেই কথাটা গোলমেলে হয়ে ওঠে। কেননা বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটারীর সঙ্গে এই দার্শনিক ল্যাবরেটারীর প্রভেদ আছে,—বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানে যা আবিষ্কৃত হবে তা নির্বিশেষ সকলের কাজে লাগবে, তার উত্তরাধিকারী সমস্ত মানুষ; কিন্তু এঁদের বহিষ্কৃত সত্য সকলের জন্য তো নয়।

এডিশন যখন বৈদ্যুতিক আলো-কে পেলেন তখন সব মানুষের জন্যই পেলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যদি কোনো আলো

পেয়ে থাকেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; সেই এজমালিতে আর-কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। নৈমিষারণ্য ও পণ্ডিচারীর অরণ্যে যারা হাঁক্‌চেন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" তাঁদের স্তোকবাক্যে খুব কম লোকই ভুলবে, কেননা আজ আর জানতে কারু বাকী নেই যে তাঁদের এই চিৎকার চিন্ময় লোকের আমদানি হলেও, নিতান্তই এ-আরণ্যিক-রোদন! তাঁদের "আদিত্যবর্ণে" পৃথিবীর অন্ধকার দূর হবার নয়। সত্যেরও আবার রকম-ফের আছে ; যেমন, যোগবলেই হোক্‌ আর চালাকির দ্বারাই হোক্‌, কতকগুলি লোকের পক্ষে মাথা দিয়ে হাঁটা সহজ হোলো—সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত সত্য, তা কখনই সার্বজনীন সত্য হতে পারে না। ঊর্ধ্বলোকের দিকে পদক্ষেপ করতে পারলে 'অভূতপূর্ব শক্তির অভ্যাগম' হওয়া সম্ভব, স্বীকার করি ; কিন্তু মূঢ়-সাধারণ-আমরা চিরদিন মাটিতে পা দিয়ে চলতেই ভালোবাস্‌বো!

পণ্ডিচারীর বিরুদ্ধে কেন আমার অভিযোগ এবং রাঁচির বিরুদ্ধে কেন নয় তার কারণ, অপরের বুদ্ধির ওপর রাঁচির আশ্রমের কোনো প্রভাব নেই, তাছাড়া রাঁচি নতুন নতুন রিক্রুটের চেষ্টা করে না। অবিজ্ঞাপিত পাগ্‌লা গারদের সুবিধা এই তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে শিকার যোগাড় করতে পারে, আর বিশেষ ক'রে এদেশে আধ্যাত্মিক পাগ্‌লামিটা যে ধরণের ছোঁয়াচে, তাতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।

এ জাতির মেরু-মজ্জা থেকে আধ্যাত্মিক মানসিকতা দূর করা আজ সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন—ঐ-মনোভাব আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ও অকৃতার্থতার মূলে। "ভগবান আছেন এবং তিনিই বাঁচাবেন"—এই কুসংস্কার নিয়ে এ-জাতটা মরতে বসেছে; আর এই সব সঙ্ঘ সেই ধ্বংসের পথটা পিছল করছে মাত্র। সেদিন শ্রীঅরবিন্দের Mother নামে বিখ্যাত বইটা পড়ছিলাম—পণ্ডিচারী থেকে কেমন ধারা সত্যের আমদানি-রপ্তানি হয় তার পরিচয়। তাতে ভগবানকে—কল্যাণময়ী জননীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তিনি পৃথিবীর সন্তানদের দুঃখ দূর করতে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত—এই-কথাই বলা হয়েছে, —অল্ রাবিশ! এইসব সুখী মানুষরা নিজেদের মনের মতো মিষ্টি ফিলজফি বানিয়ে বেশ মশগুল রয়েছেন—কিন্তু সাধারণের এই সব উচ্চাঙ্গের নেশা ধরলেই সর্বনাশ! ভগবান ভালো করেন—এই সত্য উত্তরায়নে আর অরবিন্দাশ্রমে খাটতে পারে; কিন্তু এ-কে জাপানের ভূমিকম্প, আন্দামানে অসহায় বন্দীর মৃত্যু, আমেরিকার চেন্-গ্যাঙ্, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পরিবারের অনশনভাগ্যের সঙ্গে খাটাতে গেলেই মুস্কিল। তরোয়াল যাদের কাটে তাদের সঙ্গে খাপ্ খায় না।

ভগবান এবং ধর্ম-সম্বন্ধে এঁরা যা বলেছেন বা বলতে চান তা বিল্‌কুল্ মিথ্যে—কেননা সত্য হবে আগুনের মতো, সব অবস্থায় সবার বেলায়ই তা সমান পোড়াবে। ভুয়ো সত্যের

ভাণ্ডারী-গিরি চিরদিনই কতকগুলো লোকের কাজ থাকবে, যেমন পিকেটিং-এর যুগেও অনেকে গাঁজার ভেণ্ডারী ছাড়ে নি—নেশা ধরানোই ছিলো এদের পেশা-জীবনের mission। কিন্তু এই সব ঈশ্বর-বিলাসী ধর্মপ্রাণ নিশ্চিন্ত লোককে আজ যদি বিত্তহীন ও পেট্রন্‌হীন ক'রে নিরন্নের জগতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আর কিছুতে না হোক অন্তত পেটের দায়ে তারা বুঝতে পারে যে তাদের সত্যের ভেতরে কতটা ধান আর কী পরিমাণ চাল। যিশুখৃষ্টকে যে কেন ক্রুশে দিয়েছিল তা বোঝা আজ খুব শক্ত নয়—যে-আধ্যাত্মিক জড়বাদে জগদ্ব্যাপী জর্জরতার সূচনা হোলো গোড়াতেই তার জড় মারতে চেয়েছিল তারা। আমরা-যে আজ নানাদিক দিয়ে নানা ভাবে ব্যর্থ হচ্ছি, জীবন-সংগ্রামে হঠে যাচ্ছি, ভূতকে ও ভগবানকে এবং তাঁদের পার্থিব প্রতিনিধি কর্তৃবাচ্যদের থোড়াই কেয়ার ক'রে উঁচু মাথায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে-যে আমাদের মেরুদণ্ডে টান পড়ে, আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির অভাব, এবং আমাদের পরপ্রত্যাশা—সবার চেয়ে যে পর, পরাৎপর-সেই ভগবানের প্রত্যাশা, এর গোড়ায় রয়েছে অন্ধ ভয় ও অন্ধ-আকুতি। রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের ফিলজফি হচ্ছে সেই অন্ধতার প্রোপাগাণ্ডা।

সঙ্ঘই এই সব প্রোপাগাণ্ডার মূলে শক্তি যোগায়। যে-নিষ্ফল দর্শন বই-এর পাতাতেই স্বাভাবিক মৃত্যু-লাভ করতো,

এই-সব সঙ্ঘ শুধু তাকে বাঁচিয়েই রাখে না, নেশার মত তাকে ক'রে তোলে একটা আকর্ষণ। লোকে ভাবে এতগুলো মাথা যখন ভিড়েছে তখন ব্যাপার-কিছু নিশ্চয়ই আছে,—কিন্তু মাথা-গুলো যে সব-ফাঁকি সেটা তারা ঝাঁকিয়ে দেখে না—বহু শূন্যের যোগে অঙ্কটা আতঙ্কজনক বড়ো দেখায়। অবশ্য তারা সবাই কিছু সঙ্ঘে গিয়ে যোগ দেয় না, কিন্তু সঙ্ঘের মতবাদে তারা মনোযোগ দেয়। একটু একটু ক'রে তাদের বিশ্বাস গজায়, কেননা বহুদিনের প্রচারে মিথ্যেটা তখন সত্যের আকার নিয়ে পাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামকৃষ্ণ কথামৃতের কথায় এবং অমৃতত্বে যে আমরা বিশ্বাস করি তার গোড়ায় বেলুড়-মঠের অত বড়ো বিজ্ঞাপন। সঙ্ঘ এই ভাবে সঙ্ঘীয়দের বাইরেও সর্বনাশ ছড়িয়ে থাকে।

এই জন্যই কৃষ্ণমূর্তিকে সেদিন আমি মনে মনে সাধুবাদ না দিয়ে পারিনি যেদিন তিনি অত বড়ো order of the star ভেঙে দিলেন। তাঁর ফিলজফি আমি মানি আর নাই মানি, তাঁর শুভবুদ্ধিকে আমায় মানতে হোলো। শ্রীঅরবিন্দকে আমার এই অনুরোধ, যে-বস্তু সত্য তা নিজের শক্তিতেই বাঁচে, তাকে বাঁচাতে অন্য চক্রান্তের দরকার করে না—অতএব পণ্ডিচারীর শূন্যচক্র তিনি নির্ভয়ে ভেঙে দিতে পারেন, অবশ্যি যদি তাঁর ক্ষমতায় কুলোয়। শুনি যে তিনি যোগবলে ত্রিশূন্যে বিরাজ করেন, তা তিনি অবলীলায় আবহমান করতে

থাকুন—অমন আরামের জায়গা আর হয় না। তার থেকে নামতে তাঁকে অনুরোধ করি নে। রবীন্দ্রনাথকে বলা বৃথা, কেননা ওটা তাঁর সখের জিনিস, তবে মস্ত ভরসা এই যে, তাঁর তিরোধানের সাথে-সাথেই শ্রী বিশ্বভারতী ত্রিশূন্যে উঠে যাবে—যদি না তার মতিগতি ততদিনে বদ্‌লায়।

কোনোদিন যদি এখানে সোসিয়ালিস্‌ট ষ্টেটের প্রতিষ্ঠা হয় তার প্রথম কাজই হবে দেশব্যাপী ছোট বড়ো মাঝারী যত সঙ্ঘ আছে সব ভেঙে দেওয়া ; মানুষের মন থেকে False God এবং ভূয়ো philosophy দূর করা, ভুয়ো করা ; উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা যে এ-সমস্তই—"সব্‌ ঝুট্‌ হ্যায়"। তারপরেই তার কাজ হবে হিমালয়ের একটা-গভীর-গুহা খোঁজ করে এদেশের যত কিছু ধর্মগ্রন্থ—উপনিষদ গীতা থেকে সুরু হয় রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব—সমস্ত এক করে সেই গুহার মধ্যে কবর দেওয়া। এপর্যন্ত তো কোনো আপ্তবাক্যই সার্থক হোলো না, তখন তার একটা অন্তত পর্যাপ্ত হবে—নিজের অর্থ খুঁজে পেয়ে কৃতার্থ হবে। সেটি হচ্ছে—ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্‌।

হরিজন-আন্দোলনের নব-দর্শন

অনেক উঁচুতে যিনি উঠেছেন অনেক দূর অবধি তাঁর দৃষ্টি। সমতলভূমির সমান পাল্লায় দাঁড়িয়ে যারা হাতাহাতি করে আজকের সমস্যাই তাদের কাছে একান্ত, এই মুহূর্তের লাভ-ক্ষতিই তাদের একমাত্র,—সামনের শত্রুকে সরাতে না পারলে তার শান্তি নেই। কিন্তু মহৎ-দ্রষ্টার দৃষ্টি দেশ-কালকে অতিক্রম ক'রে যায়—কেবল নিজের দেশ নয় বা দেশের বর্তমান নয়, সব মানুষের দেশ, সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তাঁর দৃষ্টি-পরিধির আওতায়। আত্মায় যাঁর আসন অদ্ভুত তাঁর আত্মীয়তা-বোধ, আমাদের ধারণার নাগালের বাইরে,—কেবল তাঁর মিত্ররাই তাঁর আপনার নয়, তাঁর শত্রুরাও তাঁর আত্মীয়। কেননা অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দেখেছেন, অনেক-কিছু তিনি দেখতে পেয়েছেন।

মহৎ-দ্রষ্টা মানুষকে নেতারূপে পাওয়া যেমন ভাগ্যের তেমনি দুর্ভাগ্যের। আসন্ন সমস্যার সমাধানই যে-সময়ে আমাদের সব চেয়ে বড় কথা, সে-সময়ে হয়ত তিনি এক শতাব্দী পরের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যে-মুহূর্তে স্বদেশের স্বার্থ-সাধনের মস্ত সুযোগ হাজির, ভালোমন্দ যাহোক্ কিছু একটা ক'রে ফেলার দরকার, তখন তিনি খতিয়ে দেখছেন স্বদেশের এই সুযোগের সঙ্গে সর্বদেশের

এমনকি শত্রু-দেশের পর্যন্ত কতখানি কল্যাণ-যোগ রয়েছে। চৌরীচৌরার প্রান্তরে অপরিহার্য স্বাধীনতাকে অবহেলায় বিসর্জন দিতে মহৎ-দ্রষ্টাই পারেন কেবল। লেনিন, মুসোলিনী, এমন কি হিট্‌লার (প্রথমোক্তের সাথে আর কারু নাম করা চলে না, যেহেতু লেনিন একজন যুগপ্রবর্তক—একাধারে মহৎ-দ্রষ্টা ও মুহূর্ত-দ্রষ্টা) যা, অনায়াসেই করতে পারেন, গান্ধীর পক্ষে তা অসম্ভব।

অস্ত্রবলে দেশোদ্ধারকরা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু যদি সম্ভব হোতোও, তবুও মহাত্মা গান্ধী তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন। নন্‌ভায়োলেন্স্‌-নীতি যে বিশেষ ক'রে এই ভারতের জন্যেই তাঁর উদ্ভাবনা একথা ভাবলে ভুল হবে, কেননা ভায়োলেন্সের সমস্যা কেবল ভারতীয় সমস্যা নয় —এ-সমস্যা এ-যুগের অস্ত্রভার-পীড়িত রক্তাক্ত পৃথিবীর। অহিংসা-মন্ত্রের দ্বারা তিনি কেবল স্বদেশের নয়, সর্বদেশের মুক্তি চেয়েছেন, সকলের শান্তি, সর্বকালের কল্যাণ কামনা করেছেন—এইখানেই তিনি মহৎ-দ্রষ্টা। মুহূর্তের লাভ-ক্ষতির খতিয়ানে তাঁর হার স্বীকার করতে হলেও ভাবীকালের ইতিহাস অন্যরকম সাক্ষ্য দেবে। সার্থকতার স্বাক্ষর হয়ে উঠবে এই ব্যর্থতার পুঁজিই। পূজিত হবেন তিনি আগামী কালের মানুষের কাছে—এই জন্যেই।

তেমনি হরিজন-আন্দোলনেও তাঁর মহৎ-দৃষ্টির পরিচয়।

অন্ত্যজদের উন্মুক্তি না হলে এ-জাতির উদ্ধার নেই, তার অন্তিমকাল আসন্ন—এই কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু হিন্দুজাতি এই বছরেই বা আগামী দশ বিশ বছরের মধ্যে মরছেনা, তার মৃত্যু-দশা ঘনিয়ে এসেছে আজ থেকে দু'শতাব্দী পরে, মহাত্মা গান্ধী সেটাই দিব্য-দৃষ্টিতে দেখেছেন। সনাতনীদের মত হয়ত এই, যে-হিন্দুরা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এত শতাব্দী বেঁচে এল, অস্পৃশ্যতার ফাঁড়াতেই সে মারা যাবে এ কখনো হতে পারে? যে-সমস্যা তাদের কাছে কাল্পনিক, মহাত্মার কাছে তা প্রত্যক্ষ। তাঁর চশমার লং-সাইট্—দু'শ বছর পরের দশা তিনি দেখ্ছেন। কিন্তু আজ এই মুহূর্তেই আমাদের অন্ন চাই, বস্ত্র চাই,—আত্ম-সম্মান চাই—আজ থেকে দশ বছরের মধ্যে স্বাধীনতা—উঁহু—সমাজতন্ত্রী স্বায়ত্বশাসন না হলে প্রতিদিনের দুর্দশা থেকে আমাদের নিস্তার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তের প্রয়োজনের কোনই ওজন নেই মহৎ-দ্রষ্টার কাছে, আজকের হাহাকার তাঁকে পীড়িত করে না। তিনি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর হয়ে লড়াই করছেন, স্বদেশের স্বার্থ-সাধনেই তাঁর লক্ষ্যলাভ নয়, নিজের দেশের সমস্যার সঙ্গে সর্বদেশের সমস্যা-সমাধানেই তাঁর আনন্দ; আত্মীয়-মিত্রের সঙ্গে অনাত্মীয়-অমিত্রের অনিষ্ট-মোচনেই তাঁর ইষ্ট-সিদ্ধি; এই-মুহূর্তের-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দু'শ বছর পরের দুর্দশাকে তিনি দূর করতে চান। মহৎ-দ্রষ্টার স্বভাবই এই,

এমনকি এটা তাঁর অপরাধও। অদ্ভুত শোনাতে পারে তবু একথা সত্য যে মহৎ-দ্রষ্টার দূর-দৃষ্টি আপাতত তাঁর সমকালীনদের দুরদৃষ্ট দূর করতে পারে না।

তবু তাঁর যথার্থ-রূপেই মহাত্মাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আজ আমার অন্নাভাব এটা যত বড় সমস্যা, তিন বছর পরে যদি আমার মৃত্যু ঘনিয়ে থাকে সেটাও তার চেয়ে কিছু কম নয়। মহাত্মা পরমান্ন দিতে চান না, পরমায়ু দিতে চান—অসামান্য দানেই তাঁর অভিরুচি।

হরিজনদের অঙ্গীকার না করলে হিন্দুদের জনহানি হবে, এমনকি অঙ্গহানিও হতে পারে; কিন্তু মহাত্মাজী বলছেন, কেবল তাই নয়—তাতে ক'রে হিন্দুজাতির তথা ভারতের প্রাণহানি হবে। যে-ব্যবস্থায় এই দীর্ঘজীবী জাতি এতদিন টিকে এসেছে তাই মেনে চ'লে তা কখনো টেঁসে যেতে পারে না, এই হোলো সনাতনীদের জবাব। মহৎ-দ্রষ্টার ভবিষ্যৎ-বাণীর মধ্যে নিছক দার্শনিক-তত্ত্ব ছাড়াও বৈজ্ঞানিক সত্য-কিছু আছে কি না তার বিচার দরকার—কেননা তাঁর মহৎ-দর্শনের মর্ম কথাটা এখনো অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়।

বড় বড় বংশধারা আপনা হতেই ম'রে আসে; যখনই সেই বংশধারা বড় হয়ে ওঠে তারপরেই তার বিনাশের পালা। এক-একটি মনুষ্যবংশ মহীরুহের মতো বিস্তৃত হতে থাকে—তার শ্রেষ্ঠ ফুল, শ্রেষ্ঠ ফলকে উদ্ভিন্ন করার আত্মপর তপস্যা নিয়ে, ;

যখনই সেই ফুল ফুট্‌ল বা ফল ধরল তখনই সেই বহুবংশবিস্তৃত বৃক্ষ-জীবনের চরম প্রত্যাশা পূর্ণ হয়ে গেল, তার একান্ত নিজের যে-জিনিষটি জগতকে দেবার ছিল দেওয়া হয়ে গেল, তার কাজ শেষ হোলো, দান ফুরোলো তার দাবীও ফুরোলো—চিরকালের মানুষের কাছে চরম কথাটি বলা হয়ে গেল তার, তার পরেই তার পরম সমাপ্তি। সারা দুনিয়ার ইতিহাস হাত্‌ড়াবার দরকার নেই—ঘরের কাছেই ঘরোয়া খবর মিল্‌বে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জনের বংশ নেই—রবীন্দ্রনাথের বেলাও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। যদিচ কোথাও কোনো কোনো প্রতিভাধরের পরেও দু'তিন পুরুষ দেখা গেছে, কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে যে প্রতিভার রাজটীকা নেই পরবর্তীদের ললাটে, তাদের কোনোরকমে টিকে থাকা কেবল। ঈপ্সিত অভিব্যক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করার প্রয়াসে বংশধারার সমস্ত প্রাণ-শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়—তারপরেও যদি কিছু বা অবশেষ থাকে তার মধ্যে প্রাণও থাকে না, শক্তিও থাকে না।

বিশেষ বংশধারার বেলায় যা সত্য, বহু বংশধারার সম্মিলনী যে-জাতি তার জীবনীতেও সেই সত্যেরই প্রকাশ। সভ্যতার চূড়ান্তে যে-জাতি উঠে গেছে তাদের সম্বন্ধে ভাবনার কথা—আর-কোনোই সম্ভাবনা নেই তাদের, দিন তাদের ফুরিয়ে এল। গ্রীস, রোম, মিশরের সভ্যজাতিদের কথা স্মরণ করা ভালো, যেহেতু স্বর্গতদের শব-ব্যবচ্ছেদ থেকে অত্য-

মুমূর্ষুকে বাঁচাবার নিদান মিলতে পারে। গ্রীক-রোমক সভ্যতাই-বা নিষ্কৃত হোলো কেন, আর হিন্দুসভ্যতাই-বা অব্যাহতি পেয়ে গেল কী ক'রে—এর মূল খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে, নানা বর্ণে বিভক্ত হিন্দুরা কখনই গ্রীক-রোমকদের মতো আপাদ-মস্তক এক সাথে সভ্য হয়ে ওঠেনি, কাজেই তারা যেমন ফুলেছে তেমনি মরেছে, কিন্তু আমাদের সর্বাঙ্গ কোনোদিন একসঙ্গে ফাঁপার সুযোগ পায়নি, এই হেতু সভ্যতার সেঁকো বিষ যেমন আস্তে আস্তে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়েছে—শেষের সেই বিষম দিনটিও তেমনি পিছিয়ে গেছে অনেক পরে। কিন্তু তাহলেও আমাদের জীবন-সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে। সেই সন্ধিক্ষণের বেশি আর দেরি নেই; এই-তথ্য আজ ধরা পড়েছে মহৎ-দ্রষ্টার চোখে।

যে-ব্রাহ্মণরা হিন্দুসভ্যতার মাথা ছিল তারা এখন টিকি-তে গিয়ে কেন টিক্‌লো—কেবল টিকিতেই নয়, টীকাতেও বটে—তার কারণ বোঝা অতঃপর কঠিন হবে না। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাও গেছে, ক্ষত্রিয়-সভ্যতাও গেছে—শক্তি ও মনীষার আভিজাত্য এখন অব্রাহ্মণের পদতলে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষা ব্রজেন্দ্র শীল, শ্রেষ্ঠ কর্মশক্তি মোহনদাস গান্ধী—দু'জনের কেউই উচ্চবর্ণ নন্। বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ—কেউই বামুন নন্ এঁরা। বামুনের মধ্যে শঙ্করাচার্য, রঘুনাথ, রঘুনন্দনের

সম্ভাবনা আর নেই। কেশব সেন ও শিশির ঘোষ, মতিলাল আর বিপিন পাল, গঙ্গাধর কবিরাজ আর মহেন্দ্র ডাক্তার, অশ্বিনী দত্ত ও মণীন্দ্র নন্দী, যতীন্দ্রমোহন ও যতীন দাস, মাইকেল এবং দীনবন্ধু ; গিরীশ ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর, লাল চাঁদ ও অতুলপ্রসাদ, রাসবিহারী বোস এবং ঘোষ, যতীনবসু ও গোষ্ঠপাল, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বোস, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বোস, রাজনারায়ণ বোস আর রাজেন মল্লিক, নীলরতন এবং বিধান রায়, আম্বেদকর আর নন্দলাল, প্রমথেশ বড়ুয়া ও সুরেশ মজুমদার, এন, এন্ সরকার আর প্রেমেন মিত্র---নিজের নিজের ক্ষেত্রে এক এক দিক্‌পাল---এঁদের সবাই অব্রাহ্মণ। সাহিত্যে বা শিল্পে, জ্ঞানে কিম্বা মণীষায়, স্বার্থত্যাগে আর আত্মত্যাগে, কৃষ্টির ক্ষেত্রে কি সৃষ্টির ক্ষেত্রে — যাঁরাই বাঙালীকে বড়ো করেছেন, তাঁদের শতকরা পঁচানব্বই জনই প্রথম বর্ণের বাইরে।

কিন্তু হিন্দু সভ্যতাকে বাঁচতে হলে কেবল শূদ্রের প্রাণ-শক্তির পুঁজির উপরেই নির্ভর করে থাকা চল্‌বে না তো। কেননা তাই-বা আর কত দিনের? উত্তমবর্ণের দিন যদি গিয়ে থাকে, মধ্যম বর্ণেরও তবে যাবার মুখে---অতএব হিন্দুর আজ বিশেষ ক'রে দরকার তথাকথিত অধম-বর্ণকে ; অন্ত্যজকে অন্তরঙ্গ না করলে কালের করাল গ্রাস থেকে তার রেহাই নেই। নতুবা যে-নিরুদ্দেশে গেছে প্রাক্-

রোমক সেই দিকেই তারও দুর্গতি—জগন্নাথও যে-পথে বলরামও সেই পথে।

'পারিয়াও'-যে সবদিক দিয়ে উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠতমদের সমকক্ষ হতে পারে এর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আমি দেবো—এজন্য অবশ্যি আমি পুরোণো পুঁথির পাতা উল্টাবো না, কবীর, নানক, দাদুকে ধরেও টানাটানি করতে চাইনে, সমসাময়িক এক মুচির ছেলের কথাই আমি এখানে বলবো ঃ—

তথাকথিত নীচ কুলে, গরীব মুচির ঘরে দীননাথ দাসের জন্ম। গ্রামের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই কলকাতার গোয়াবাগানে এসে জুতোর কারবার তাঁকে সুরু করতে হয়। কিন্তু সেই বয়সেই ব্যবসায়-প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা সামান্য নয়; সেই সময়ে ১২৭২ সালের বিখ্যাত আশ্বিনে-ঝড়ে চামড়া-বোঝাই এক বিলিতি জাহাজের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে, তখন তার জলমগ্ন চামড়া সস্তায় কিনে নিয়ে দীননাথ কিস্তি-মাৎ করেন। সেই থেকেই তাঁর ব্যবসা বেড়ে উঠতে থাকে। তার পরেই তিনি বিদেশী ট্যান্-করা চামড়া বর্জন করে এ'দেশী চামড়ায় টান দেখান—এখানেই ট্যানিংএর কারখানা পত্তন ক'রে। আজকাল অবশ্যি স্বচর্মপ্রিয়তা সুলভ—'স্বচর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরচর্মো ভয়াবহ', এই হচ্ছে এ-যুগের বাণী—কিন্তু সে-যুগে স্বদেশী-চর্ম-নিষ্ঠা যাঁরা দেখিয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে

সর্বপ্রথম। রাজা রাজকিষেণ ষ্ট্রীটে রাধা-গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠাও তাঁর কীর্তির একটি—অনাহারী অতিথির জন্যে যে-দেবায়তন সর্বদাই মুক্তদ্বার, বোধহয় সারা ভারতবর্ষে এই হচ্ছে হরিজন-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র দেবমন্দির। কিন্তু চর্ম-নিষ্ঠার জন্যও না, ধর্ম-নিষ্ঠার জন্যও নয়, তাঁকে আমি বড়ো বল্‌ছি তাঁর কর্ম নিষ্ঠার জন্যই; তাঁর অগাধ-ধনশক্তির সাহায্যে যে-অফুরন্ত প্রাণ শক্তিকে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন অসংখ্য জনসেবায়—নানান্ লোকহিতকর কাজে (ইস্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, অন্নকষ্ট-জলকষ্ট-পথকষ্ট মোচন ইত্যাদিতে) সেইজন্যই তিনি মহৎ, দেশ-কল্যাণ-ব্রতের ইতিহাসে যাঁরা কীর্তি রেখেচেন ও রাখবেন তিনি তাঁদের সঙ্গেই কীর্তিত হবেন।

এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীর অবকাশে যে অসামান্য কর্ম-প্রতিভা ও লোকহিতৈষণার পরিচয় আছে তাই থেকেই অনুমান করা কঠিন হবে না যে এই অনালোকিত লোকের অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত কূলে কূলে যে বিরাট প্রাণশক্তির স্রোত কুল্‌কুল্ করে বইছে এটা তার একটা ঢেউ মাত্র। যেখানেই, ভাগ্যক্রমেই হোক, পারিপার্শ্বিক সুযোগেই হোক বা পুরুষকারের বলেই হোক্, বাইরের বাধা সরিয়ে কোনো অন্ত্যজ নিজের অন্তরকে উন্মোচিত করতে পেরেছে, সেখানেই প্রাণ-শক্তির এই বিস্ময়কর উদ্ভাসনা প্রত্যক্ষ হয়েছে।

পারিয়ার প্রাণের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, অনপচয়িত; বিপুল

সম্ভাবনা উন্মুক্তির অপেক্ষায় সেখানে উন্মুখ, উপর থেকে জগদ্দল পাষাণের বাধাটা সরিয়ে নিলেই হয়। মহাত্মার অচল-আয়তনের দ্বারমুক্তি-ঘোষণা আর কিছুই না, হরিজনের আত্মপ্রকাশনার পথ। ওদের মধ্যে বিপুল ও বিচিত্র প্রতিভা ফেটে পড়বার প্রতীক্ষায় রয়েছে, যখন ফাট্‌বে বন্যার মত ফাট্‌বে, দেখতে না দেখতে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, রাজনীতিতে, সমাজ-দর্শনে, লোকযাত্রায়—এক কথায় গোটা হিন্দুসভ্যতার মোটা পটভূমিতে নব-জীবনের পূর্ণ প্লাবন নিয়ে আসবে।

অতীত-কীর্তির অজুহাত নিয়ে টিক্‌ব, মহাকালের কাছে এ আব্‌দার চলেনা, বাঁচ্‌তে হলে ভবিষ্যতের মূলধন চাই। অ চ ল-এর পরেই অ ধ ম—শুধু প্রথমভাগেই নয়, জীবনের সববিভাগেই। অতীত আঁক্‌ড়ে ব'সে আছে ব'লে উচ্চবর্ণের হিন্দু, জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে হঠে যাচ্ছে ক্রমশ, হঠে যাবেও তারা—যদি-না সময়ের সঙ্গে হেঁটে যায়। সময়মত দু'চারটে জোড়াতালি লাগিয়ে সময়োচিত হওয়া যায় না, আধুনিক-গ্লাসকেসে-রাখা মিউজিয়মের জীবরা বর্তমানের সমসাময়িক নয়। ভবিষ্যতের মূলধন চাই—এই মূলধন আছে হরিজনদের। আর আছে ভারতীয় মুসলমানের। প্রতিভার মহাপ্লাবন তাদের মধ্যেও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। মোগল পাঠান তুর্কী ইরাণীর যে-বংশধরেরা এ'দেশে আছেন তাঁদের কথা আমি বল্‌চি না, তাঁদের

রাজত্ব ঢুকেছে ব'লেই মনে করি, কিম্বা হয়ত তাদের দশা উচ্চ-হিন্দুর মতো অতটা কাহিল না হতেও পারে; আমার ভবিষ্যদ্‌-বাণী এদেশী মুসলমানের সম্বন্ধে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে হরিজন আত্মসাৎ ক'রে সম্ভাবনার ঐশ্বর্যে হিন্দুকে স'ত্যিই যারা বে-দখল করেছে। সংখ্যা বাগিয়ে বা শঙ্কা জাগিয়ে মুসলমানেরা বড়ো হচ্ছে এ-কথা বলা মিথ্যা কথা বলা—বড়ো না হয়ে পারে না ব'লেই তারা বড়ো হচ্ছে; আগামী শতাব্দীতে এদেশী মুসলমানের আর হিন্দুদের-মধ্যে-যারা অন্ত্যজ তাদেরই জয়জয়কার।

অতএব হিন্দুকে যদি জাতি-হিসেবে বাঁচতে হয় তাহলে হরিজনদের স্বীকার করতেই হবে, কেবল ছোঁয়াছুঁয়ির আওতায় এনেই নয়, সামাজিক আত্মীয়তার স্বীকরণে—বৈবাহিক আদান-প্রদানে—রক্তের-অঙ্গীকারে এক হয়ে। বস্তুতঃ, এই রক্তমিশ্রণের উপরেই উচ্চ-হিন্দুর পুনরুজ্জীবন, নব- প্রতি-ভায়ণ নির্ভর করছে। সার্বজনিক একাত্মীয়তা হোলো হিন্দু-সভ্যতার গোড়ার কথা, তাকে অস্বীকার ক'রে টেঁকা যদি-বা যায়, বাঁচা যায় না।

হর্স রেসের সঙ্গে হিউম্যান্ রেসের মিল এইখানেই যে, একই ঘোড়া কিছু বারবার জেতেনা—বাজির-পর-বাজিতে জিতে জিতে যায় না, ডিগ্‌বাজিও খায়, তেমনি একজাতের জয়যাত্রাও চলেনা বরাবর। পরিশুদ্ধ রক্তের নির্জীবতা যতই বেড়ে চলে, অতীত

কীর্তি আর গতানুগতিকতার বোঝা ততই তার গতিবেগ মন্দ করে—যেমন বিজয়ী ঘোড়ার হ্যাণ্ডিক্যাপ্ বাড়ার সাথে সাথে সে পিছিয়ে পড়তে থাকে, তখনই আসে পেছনের ঘোড়ার বাজি মারার পালা।

ইতিহাস মাঝে মাঝে নোটিশ না দিয়েই মোড় ঘোরে, যে ছিলো সবার পেছনে সে এসে পড়ে সবার আগে; পায়ের নীচে যার ঠাঁই ছিল হঠাৎ দেখি তাকে ঘাড়ের ওপরে। এই ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে আর্য, মোগল ও পাশ্চাত্য সভ্যতার রথ চক্র চ'লে গেছে, ইতিহাসের পাতায় তারই দাগ খুঁজে খুঁজে যে-মুহূর্তে সবাই আমরা মুহ্যমান, তখনই মহৎ-দ্রষ্টা তাঁর তৃতীয় নেত্রে মহত্তর সভ্যতার অভ্যুদয় লক্ষ্য করেছেন। হরিজন-আন্দোলনে সেই-মহৎ সম্ভাবনার সূচনা, সেই আগামী সভ্যতার আগমনী—তাঁর তৃতীয় নেত্রের ইসারা। কিন্তু আমরা কি সাড়া দেব?

শূদ্র না ব্রাহ্মণ ?

সমস্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ব'লে ঘোষণা করা হোক, এই মর্মের একটা প্রস্তাব সম্প্রতি হয়েচে।

এই প্রস্তাবে আমার আপত্তি। পৃথিবীর কোথাও একদল মানুষ আছে যারা নরখাদক, সেই কারণে পৃথিবীর সব মানুষকে নরখাদক ব'লে ঘোষণা করা হোক—এই মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। বরং আমার মতে, সম্ভব হলে, নরখাদকদেরই মানুষ করার পক্ষে চেষ্টা হওয়া উচিত।

'ইংরাজ'—এই-শব্দটি উচ্চারণ করলে পৃথিবীর আজ যে-কোনো প্রান্তে যে-কেহ সমঝ্দার লোক বুঝতে পারে যে এই নামধেয় যে-জাতি, তারা বর্বরতার একটা সভ্যরকম রূপ দিতে পেরেচে, অত্যাচারকে শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে চালাতে পেরেচে এবং শোষণের ফলে শোষিতের মনে অবিমিশ্র আনন্দ দিতে করতে পেরেচে—এইরূপ অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য আছে ব'লেই পৃথিবীর তারা অষ্টম আশ্চর্য। বর্তমান যুগে ইংরেজ যা সম্ভব করেচে সেই-বস্তু অতি প্রাচীন যুগেই আমাদের ব্রাহ্মণেরা সমাধা করেছিলেন। এজন্যে তাঁরাও কিছু কম যান্ না—পৃথিবীর আদিম আশ্চর্য তাঁরা।

শোষণের জন্যই শাসন—এই সনাতন-মূলনীতির মূলাধার ব্রাহ্মণ। শোষণকে প্রচ্ছন্ন করতে হলে শাসনকে একটা আদর্শের নামে খাড়া করতে হয়, অতীতকালের ব্রাহ্মণরা

ডিপ্লোমাসির এই গূঢ়-তত্ত্ব ভালো করেই জানতেন। ভারত-যে একদা সভ্য ছিল অর্থাৎ বর্বরতাকেও লজ্জা দিতে পেরেছে—সেকালের বামুনেরাই তার প্রমাণ।

'ও'—এই একাদশ বর্ণকে অনুনাসিক স্বরে উচ্চারণ করলে যে-প্লুতস্বরের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলে শূদ্রের বিষম দশা! তা যদি শূদ্রের কণ্ঠ থেকে বেরয় তাহলে তার জিভ কেটে ফেলতে হবে এবং যদি কাণের ভেতরে ঢোকে তাহলে তার কর্ণকূহরে শিসে গলিয়ে ঢালার সুব্যবস্থা। বামুনদের সভ্যজনোচিত শাসন-নীতির এমন বহুতর দৃষ্টান্ত মনুসংহিতার পাতায় পাতায়। জলদস্যুদের যে-সব-বংশধর আধুনিক কালে সভ্য হয়ে উঠেচে, শাসননীতির দিক দিয়ে, 'দেববংশসম্ভূত' পৌরাণিক ব্রাহ্মণদের এখনো তারা লজ্জা দিতে পারেনি।

শোষণ-নীতির দিক দিয়েই পেরেচে কি?

আমি বলি, আজ্ঞে না।

ইংরেজরা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিকে জড়ীভূত করবার চেষ্টা করেচে বটে, কিন্তু প্রায়ই তার জোড় ভাঙে—তখন দ্বিধাগ্রস্ত দুই নীতির আপনা-আপনির মধ্যে ঠোকাঠুকি বেধে যায়। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ ধর্মনীতির সঙ্গে অর্থনীতির যে-সমন্বয় সাধন করেছিলেন তা আজো অক্ষুণ্ণ রয়েচে,—তাঁরা সেই প্রাচীন যুগে যে শোষণ-যন্ত্রের স্থাপনা করে গেছেন

তার যন্ত্রণাহীন চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হতে আজো আপনা থেকেই লোক এগিয়ে আসে। সত্যি, দিব্যদর্শন ছিলো বইকি তাঁদের; কেননা এই মানুষ-পেষা-কল চালিয়ে তাঁদের বংশধরেরা যে চিরকাল ধরে করে-খাবে এটা-তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের দূরদৃষ্টির বলেই এই সেদিন পর্যন্ত বামুনরা নিজেদের দুরদৃষ্টকে ঠেকিয়ে এসেচে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাকসো-আদায়ের যে 'শিডিউল' তাঁরা সেকালে বেঁধে গেছেন, একালে এমন কোনো অর্থনীতিক মাথাই নেই যে তার সমান একটা কিছু বানাতে পারে। বারো মাসে তের পার্বণ, নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার্চনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ এসব তো লেগেই রয়েছে—বরাবরের ব্যাপার! কিন্তু এসব উপলক্ষ্যে পৌরহিত্য করবে কে?—বামুন। দান করবো কাকে?—বামুনকে। দানের বৈচিত্র্যই-বা-কতোরকমের! সোণা-রূপো হাতী-ঘোড়া কাপড়-চোপড় বাসন-কোশন থেকে সুরু ক'রে কাহন কাহন কড়ি পর্যন্ত—যার যেমন সাধ—যথাসাধ্য!

শুধুই কি দান? তার সঙ্গে গণ্ডে-পিণ্ডে ভোজন! নেহাৎ কম হলেও অন্তত 'দোয়াদশটিকেও' তো খাওয়াতে হবে? এবং ভোজনের সঙ্গে দক্ষিণাটাও নগদ! অথচ দাতার পুলক ধরে না! অপাত্রে এই-নির্বিচারদানের কোনো যুক্তি হয় না, কিন্তু দাতার মনে কোনোই প্রশ্ন নেই। এই কায়মনোবাক্য দানের

ফলে তাঁর অক্ষয় স্বর্গবাস কায়েম হচ্চে! পোষণের ফলে তোষণের সৃষ্টি করার অদ্ভুত এই প্রতিভা, আমি শুধু ভাবি, সে-যুগে এ-সম্ভব হোলো কি ক'রে? এযুগের ট্যাক্‌সো-আদায়ের একশোরকম কায়দার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অবাক্ হতে হয়—কানুনের হেরফের থাক্‌লেও কায়দায় এরা এতই অনুরূপ যে মৌলিকতার দিক দিয়ে রূপের মিল অণুমাত্র হলেও কৌলিকতায় এরা সমগোত্র। ইতিহাসের মতো, সভ্যতাও কি খোল নলচে বদ্‌লে বদ্‌লে আসে, নাকি?

এবং আরো বিস্ময় এই যে, আওরঙজেবের বহুপূর্বে জন্মগ্রহণ ক'রেও মানুষের ওপর ট্যাক্‌সো আদায়ের যে-বিধিনিষেধ তাঁরা বের করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব; এমনকি এ-বিষয়ে পরবর্তী আওরঙজেবকেও তাঁরা টেক্কা মেরে গেছেন। মনে করুন, কোনো ভাগ্যবান ভারতভূমিতে জন্মালেন। ছ'দিনের দিন তাঁর ষেটেরা পুজো, ছ'মাসে অন্নপ্রাশন, ছ'বছরে উপনয়ন',* তারপর বিয়ে, তারপরে তাঁর বংশবৃদ্ধি এবং সবশেষে তাঁর শ্রাদ্ধ।—এর সব উপলক্ষেই বামুনদের ট্যাক্‌সো দিতে হবে। এমনকি ম'রেও খাজনা

* শূদ্রের না হলেও ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-এদের উপনয়ন হোতো—ব্রাহ্মণেতর সবাইকে আমি শূদ্রের মধ্যে ধরেচি, যেহেতু তাঁদের বংশধরেরা সবাই আজ শূদ্র। অবশ্যি বামুনের ছেলেরও পৈতে হোতো,—নিজেদের নিয়ম নিজেরাই তো নাকচ করতে পারেন না,—এইজন্যে তাঁরা নিজেদের বেলা 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়'—এইভাবে নিয়মের পিত্তি-রক্ষা করতেন।

এড়িয়ে ফাঁকি দেবার যো নেই। অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ যে একদা জন্মেছিলেন, তার জন্যে অতি-আধুনিক প্রপৌত্রকে প্রতি বছরে ট্যাক্‌সো দিতে হয়। শ্রাদ্ধ গড়ায় অনেক দূর!

বণিকবৃত্তি বা ব্যবসা-বুদ্ধিতেই কি তাঁরা কম ছিলেন? এমন অপবাদ তাঁদের কোনো শত্রু, এমন কি আমিও দিতে পারবো না। বিনা পুঁজিতে লিমিটেড্ বা আন্‌লিমিটেড্ কোম্পানি গড়ে যে-সব কারবার অতি পুরাকালে তাঁরা ফেঁদে গেছেন আজ অব্দি তার একটাও দেউলে হয়নি, বরং লভ্যাংশে বেড়েই চলেচে দিন-দিন। এই গুরুগিরির ব্যবসাটাই কি কম ফলাও? কিঞ্চিৎ শব্দব্রহ্মের বিনিময়ে বংশানুক্রম কাণ ম'লে কাঞ্চনমূল্য আদায়! বিনা ট্রেড্‌মার্কেই এই ব্রহ্মের-ব্যবসা চলে! তীর্থ, মঠ, গুরু আর মোহন্ত—এদের উপায়ের কাছে ফোর্ড-রকফেলার সাহেবের আয়ও কিছু না।

সভ্যতার দুটো দিক, একদিকে তার হীনবৃত্তি আর একদিকে তার উদ্‌বৃত্তি। একদিকে সে বর্বর—নিজে বাঁচবার জন্য অপরকে মারতে তৈরি সে; বিধাতার দেওয়া দুটো হাত আলিঙ্গন করার পক্ষেই যথেষ্ট, অপরকে শাসন ও শোষণ করার জন্য তাই সে এখানে আরো ছটা হাত সৃষ্টি ক'রে সেজেচে অক্টোপাশ; এখানে তার কূট চাল ও নখদন্ত-চালনা কখনো প্রকাশ্য কখনো প্রচ্ছন্ন। ইউরোপীয় সভ্যতার এই দিকে আছে বার্কেন্‌হেড্, ডায়ার্—এদের মতো লোকেরা।

কিন্তু সভ্যতার আরেকটা দিক আছে যেখানে তার উদ্বৃত্তি, যেখানে তার ঐশ্বর্য, যেখানে সে অপরকে দিতে উন্মুখ, যেখানে সে অপরকে বাঁচালে ভাবে আমি বাঁচলুম, যেখানে অপরে অসম্পূর্ণ থাকলে তার নিজের পূর্ণতা নিরর্থক মনে হয়; যেখানে সে বলে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম্। ইউরোপীয় সভ্যতার এদিকটায় আছেন ইউরোপের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, শিল্পী কবি-মনীষীরা। সভ্যতার এই অংশটাই অপরাংশকে অসম্পূর্ণতার লজ্জা ও অগৌরব থেকে মোচন করে, তার ভারকেন্দ্র স্থির রাখে, সভ্যতাকে যাতে সভ্যতা ব'লেই সন্দেহ হয়—এমন বিভ্রম-রচনার চেষ্টা করে।

কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাচীন সভ্যতায় আমরা কেবল প্রথম গোত্রেরই পরিচয় পাই—যেখানে সে আত্মপ্রসাদের জন্য দু'হাত বাড়িয়ে কেবলি নিয়েচে; কিন্তু আত্মপ্রসারের জন্য যেখানে দু'হাতে দিতে হয় সভ্যতার সেই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের দেখি অতি কদাচ। একেবারেই-যে দেখিনে তা নয়, কেন-না বামুনদের মধ্যেও কখনো কখনো মানুষ জন্মাতে পারে।

এইজন্য ব্রাহ্মণ-সভ্যতার একদিকে যেমন মনু, পরাশর, পরশুরাম প্রভৃতিকে দেখতে পাই যারা দোর্দণ্ড প্রতাপে দোহন করেচে, শাসন করেচে, নির্বিচারে হত্যা করেচে ও চক্রান্ত করেচে; তেমনি অপরদিকে বাল্মিকী ও বেদব্যাসের মতো অপরাজেয় স্রষ্টার সন্ধান পাইনে। এইজন্য

সভ্যতার যে-একাংশে বামুনের একছত্র, সেখানে তারা যা রেকর্ড্ রেখে গেছে এ অবধি বহু বহু সভ্যজাতি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সেই রেকর্ডের কাছাকাছিও ঘেঁষতে পারেনি। ব্রাহ্মণ পরশুরামের সঙ্গে ম্লেচ্ছ ডায়ারের তো তুলনাই চলে না, হত্যা-নৈপুণ্যে পরশুরামের কড়ে আঙুলের যোগ্যতাও ডায়ারের নেই।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতাই যদি ভারতীয় সভ্যতার শেষ কথা হোতো তাহলে তেমন দুর্দিন পৃথিবীর আর কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এড়িয়ে উঠতে না পারলেও তার সভ্যতাকে পেরিয়ে যা উঠেছিল তাই হচ্ছে হিন্দুসভ্যতা—এই সভ্যতারই দিগ্ব্যাপ্ত কিরণের মধ্যে ব্রাহ্মণের কলঙ্কও অনেকটা শোভার মতোই দেখাচ্চে। এই সভ্যতা আসলে ব্রাহ্মণেতর জাতির সৃষ্টি।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দুটি পুঁজি, মনুর গত-কাল আর পরশু-রামের পরশু; পেনাল্ কোড্ আর রেগুলেশন লাঠি। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার মধ্যেই আমরা পাই ভারতের দর্শন, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—তার ঐশ্বর্যের সহস্রমুখী উৎসার! তার মধ্যেই আমরা পাই, দস্যু বাল্মিকীর রামায়ণ, জেলেনার ছেলে বেদব্যাসের মহাভারত। যে উপনিষদের গর্বে আমরা মশ্গুল, তারও বেশির ভাগ ক্ষত্রিয়ের রচনা। আয়ুর্বেদ, রসায়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও অব্রাহ্মণেরই প্রতিভা।

এই হিন্দুসভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান অতি সামান্যই, বলতে গেলে ব্রাহ্মণের থেকে যতটা এ নিয়েচে—বর্ণ-বিচার, স্পর্শদোষ আর 'ন-স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—তাই এর কলঙ্ক। ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রভাবিত না হলে এ সভ্যতা আরো প্রাণবান, আরো বেগবান, আরো বীর্যবান হতে পারতো—বিশ্ববিজয় করতো এ-সভ্যতা। ভারতীয় এই সভ্যতায় অনার্যের দান আছে, বৌদ্ধের দান আছে, মুসলমানের দান আছে। এর স্রষ্টাদের মধ্যে এককালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য হয়ত ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, বিপুল শূদ্র-শক্তি আত্মসাৎ করেচে তাঁদের। শূদ্রের দ্বারাই এই সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি, এজন্য আমি একে বলবো শূদ্র-সভ্যতা এবং এই জন্যই এ বিরাট, এই এর মাহাত্ম্য—ব্রাহ্মণ-সভ্যতার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো—এই হিন্দুসভ্যতা। ব্রাহ্মণ না জন্মালেও এ হোতো এবং ব্রাহ্মণ লোপ পেলেও এ থাকবে। বরং বামুনের প্রাধান্য লোপ পেলে এই সভ্যতার প্রাণশক্তি পূর্ণ-মুক্তি পাবে; বৌদ্ধযুগে যেমন হয়েছিল তেমনি ভারতের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য আবার সহস্রদলে আত্মপ্রকাশ করবে।

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব কী উপায়ে ঘোচানো যায় তাই আজকের সমস্যা। আজকের সমাজের ওপর আজকের বামুনদের, বামুন ব'লে কোনো প্রভাব আছে, এ আমি মনে করিনে। যে-ব্রাহ্মণ এখনো এর কাঁধে ব'সে কণ্ঠরোধ ক'রে রয়েচে তা অতীতের কঙ্কাল-মূর্তি—তার কাল-কবল থেকে

মুক্ত করা মানে একে অতীতের কবল থেকে বিমুক্ত করা। এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আর যে-উপায়ই থাক, সমস্ত হিন্দুকে বামুন ব'লে ঘোষণা করা সে-উপায় নয়। কেননা, প্রথমত, তাতে সমস্ত হিন্দুব তথা মানুষের মানহানি; দ্বিতীয়ত, যে-বস্তুর বিলোপ বাঞ্ছনীয় এবং বস্তুত যা মরতে বসেচে তাকেই শুধু মর্যাদা দেওয়া নয়, আবার জীইয়ে তোলা।

তাই, ঘোষণা যদি করতেই হয়, অব্রাহ্মণ-নির্বিশেষে সবাইকে শূদ্র ব'লে ঘোষণা করাই ভালো, কেননা শূদ্র বামুনের চেয়ে মহত্তর জাত। 'মহত্তর' বল্লাম ব'লে কেউ যেন না মনে করেন যে বামুনদের, জাতিহিসেবে, আদৌ আমি মহৎ ব'লে মনে করি। কিন্তু মহৎ ব'লে মানি আর নাই মানি, নিপুণ ব'লে তাঁদের আমি মানবো। যে-অশ্বমেধের ঘোড়া দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল তার মুখে লাগাম লাগিয়ে তাকে ময়লা-টানা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব না থাক, নৈপুণ্য যথেষ্টই। যে শূদ্র-ভারত, একদা বৌদ্ধ যুগে আপন আত্মার পূর্ণ প্রকাশকে ধ'রে রাখতে না পেরে, নিজের কূল ছাপিয়ে, আর্দ্ধেক পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে তার আদর্শের সাম্রাজ্য-বিস্তার করতে চেয়েছিল, তাকেই আবার অন্ধকূপের মধ্যে টেনে কোণঠাসা ক'রে আনা এবং কেবল ইচ্ছামাত্র তার গতিরোধ নয়, ইচ্ছামতো তাকে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত ময়লা টানানো সামান্য বাহাদুরি নয়। মুষ্টিমেয় ইংরেজ যে-কৌশলে ত্রিশ

কোটি ভারতবাসীকে শাসন করে, মুষ্টিমেয় বামুনের কেরামতি তার চেয়ে একটুও কম নয়। ইংরেজের সম্মুখে আছে সঙ্গীন্ বন্দুক, কিন্তু বামুনের মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক,—অশুদ্ধ হলেও কিছু যায় আসে না, নিছক বিসর্গের বুলেট দিয়ে যে-সাম্রাজ্য আদি যুগ থেকে এ পর্যন্ত সে রক্ষা করেচে, ভূগোলেব মধ্যে তার বিস্তর দেখা না গেলেও ভূলোকের দীর্ঘতম কালের ইতিহাসকে তা আচ্ছন্ন ক'রে রইলো। মানুষের দুর্গতির এতদূর গতি আর হয় না।

এই জন্যই মনে হয় যে ভারতের ইতিহাসের গতি বদলাতে হলে আগে বামুনের একটা বিধি করা দরকার। অমৃতসরে ডায়ার ভারতের লোককে কী ক'রে বুকে হাঁটাতে পারলো, ভাবতে গিয়ে আমরা চমৎকৃত হই। সরীসৃপকেই বুকে হাঁটানো যায়, মানুষকে না। যুগ-যুগান্ত ধ'রে যে-জাতি সূত্রগুচ্ছ দেখলেই বুক দিয়ে মাটি আশ্রয় করেচে সঙ্গীন্ দেখলে সে যে আরো অনায়াসে তাই করবে এ তো আশ্চর্য কিছু নয়। কেন না, সঙ্গীন্ ব্রহ্মশাপের চেয়েও সঙীন এবং তার গুঁতো সূতোর চেয়ে একটু শক্তই! বামুনকে কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে এ জাত কোনোদিনই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মনুর সত্ত্ব লোপ না পেলে এ দেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া অসম্ভব। সেটা হবে হাওয়ার কেল্লায় আকাশ-কুসুম।

এ জাতির প্রাণশক্তি যে সহস্র ধারায় উচ্ছলিত হয়ে

ওঠে না তার কারণ, সামান্য সঙ্কীর্ণ পথেও আপনাকে প্রকাশ করবার সুযোগ তার নেই—এই জন্যই কোনদিনই তার নিজেকে জানা ও নিজেকে পাওয়া হোলো না; পৃথিবীর কাছেও সে অচেনা থেকে গেল। মনের সহিত মনের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের ফলেই চেতনার ভাণ্ডারে শক্তির সঞ্চয় সম্পূর্ণ হতে থাকে—সেই শক্তির সাহায্যেই মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা সমাজের ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে বা ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে। আমাদের সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার সব ক'টা পথই রুদ্ধ।

আমরা নারীকে বলি দেবী, তাকে সমকক্ষ মানুষ ব'লে ভাবতে পারিনে। অবশ্য নারীকে আমরা নিখুঁৎ রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে, সব রকম আপদ-বিপদের আঁচ থেকে রক্ষা ক'রেই চলি, কিন্তু আগে খোঁড়া ক'রে রেখে তারপরে তাকে মাথায় ক'রে বয়ে নিয়ে বেড়ানোয় দাক্ষিণ্য প্রকাশ পায় না। বিধাতার দেওয়া পা থেকে বঞ্চিত ক'রে কাঁধের ওপর স্থান দিয়ে ভাবতে পারি যে তাকে উচ্চপদ দিলুম, কিন্তু দুনিয়ার দরবারে সে পদচ্যুতই র'য়ে গেল। মাঝে থেকে আমাদের পা দু'টোর বিপদ এই হোলো যে তারা মনে করে স্থির ভাবে বহন করাই তাদের কাজ, চলা তাদের নয়।

আমরা মানুষকে দরিদ্র ক'রে রাখি এবং সেই দরিদ্রকে ডেকে বলি, তুমি নারায়ণ; সেটা তাকে স্রেফ উপহাস।

তার দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা আমাদের নয়—সেটা বজায় রাখাই কায়েমী নারায়ণ সেবার অঙ্গ ব'লে বোধহয়। আমরা মুখে বলি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের ছায়া মাড়ালেও আমাদের নাইতে লাগে। তারা যে বামুনের তুল্যই মানুষ এ কথা আমরা ভাবতেই পারিনে। মানুষ মাত্রেই ব্রহ্ম, সে ঠিক; কিন্তু তাই ব'লে কি তারা ঐ বামুনের সমান? ব্রাহ্মণ যেন ব্রহ্মেরো বড়ো!

এই ভাবে নারীর সঙ্গে পুরুষের, নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলার অর্থগত, সমাজগত ও ধর্মগত হাজারো রকমের বাধা। অথচ চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সঙ্গ যদি সহজ না হয়, অবাধ না হয়, বিচিত্র না হয়, তবে আমাদের সম্পূর্ণতাই-বা আসবে কোন পথে, সার্থকতাই-বা পাবো কোন ফাঁকিতে? মিলনের রহস্যই-যে পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো রহস্য, দেবার ও পাবার ঐ একটি মাত্রই-তো প্রণালী।

এ যুগের সব চেয়ে বড়ো সমস্যা মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথ খুলে দেয়া, চওড়া করা; সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে এরই ওপর। রাষ্ট্রনীতিক দিক দিয়ে, অর্থনীতিক দিক দিয়ে, সামাজিক দিক দিয়ে—নানা আদর্শে ও নানান্ ভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই আজকের কাজ। এই জন্যই যে-কারণে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই সকলের ধনসাম্য, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সকলের সমানাধিকার, সেই

কারণেই সমাজিক ক্ষেত্রে চাই সকলের একীকরণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন যাতে সহজ ও সুন্দর হয়, আমাদের সকল চেষ্টার মূলে সেই প্রেরণা।

কিন্তু সূত্রের দর বাড়িয়ে সবাইকে সূত্রধর বানিয়ে দিলেই এই একীকরণ সম্ভব হবে না, কেননা সাম্যের প্রতীক ব্রাহ্মণ নয়, সে হচ্চে ভেদের মূর্তি। সবাইকে শূদ্রত্বের মর্যাদা দিয়ে বরং সেটা সম্ভব। ব্রাহ্মণের অতীত কলঙ্কিত এবং ভবিষ্যৎ শূন্যাকার—তার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত, তার আদর্শের ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ যে যেখানে কেবল তাদেরই ধরে, ধরিত্রীর সমস্ত মানুষের ঢোকার পথ সেখানে নেই। এই ভারতের স্রষ্টা শূদ্র, এর আদিম অধিবাসী শূদ্র, এর সভ্যতা শূদ্র-সভ্যতা। ব্রাহ্মণের দিন ফুরিয়ে এসেচে, বামুনের আগেও এই ভারতে শূদ্র ছিল এবং শূদ্রই পরে থাকবে; কেননা এর প্রাণশক্তি প্রচুর—অফুরন্ত এর সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের মাথা নয়, তার টিকি মাত্র;—এই পৌরাণিক তুশ্চিহ্ন লোপ পেলে তার একমাত্র ক্ষতি এই হবে যে তাকে ভয়ঙ্কর আধুনিক দেখাবে।

কেউ হয়ত ভেবেই আকুল হবেন, বামুন যদি গেলো তবে ব্রহ্মচর্চা করবে কে! একদল লোক ব্রহ্মসেবা, আরেক দল শক্তিসেবা এবং তৃতীয় দল পদসেবা করলে তবেই-না হবে আদর্শসমাজ! কিন্তু আহায়, জকের মানুষ যে সম্পূর্ণ হতে চায়,—ব্রহ্মবিদের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, বৈশ্যের ঐশ্বর্য,

শূদ্রের শ্রম—সবাতেই সে চায় সমান অধিকার;—ভাগাভাগি হিসেবে আধখানা মানুষ হয়ে তার সুখ নেই। মনুষ্যত্বের পূর্ণতার জন্য যদি ব্রহ্মচর্চার প্রয়োজন থাকে তাহলে সে প্রয়োজন প্রত্যেক মানুষের,—কোনো বিশেষ শ্রেণীর ওপর তাব বরাত দেওয়া যায় না। দিলে যা হয় তা ব্রহ্মচর্চা নয়, ব্রহ্ম-চর্চড়ি—কেননা এই জিনিসই একজনে পাকিয়ে সকলের পাতে পরিবেশন করতে পারে।

কেবল বিভিন্ন জাতির সভ্যতা আত্মসাৎ ক'রেই হিন্দু-সভ্যতা বিরাট হয়নি, বিভিন্ন জাতির রক্তের সঙ্গেও এর মিশ্রণ ঘটেছিল। অনার্য, শক, হূন, দ্রাবিড়ের সঙ্গে যথেষ্ট আর্য-রক্ত মিলিত হয়ে হিন্দুর দেহ গড়েচে। বৌদ্ধ যুগের তো কথাই নেই, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক, কৌলিন্য-প্রথার ফলে, বামুনের সঙ্গেও এই শূদ্র-রক্তের নেপথ্য-মিলন ঘটেছে। অদূর ভবিষ্যতে মুসলমান ও খৃষ্টানকে আত্মসাৎ ক'রে এই শূদ্র-সভ্যতা আরো মহত্তর হবে। মিলনের পথে, মহিমার পথে আপনাকে সম্পূর্ণ করবে। অচলায়তন ভেঙে মুক্তি-পথ রচনার দায়িত্ব তার। ভারতের সভ্যতা বিপ্রবর্ণ নয়, শূদ্রবর্ণ; ভারতের ভবিষ্যতও তাই।

বিজ্ঞানের সার্থকতা

দিলীপকুমার রায় 'উত্তরার' পৃষ্ঠে প্রচণ্ড রকমের একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছেন ; আঠারো-পৃষ্ঠা-ব্যাপী তাঁর বিরাট দক্ষিণা—"বিজ্ঞানের ট্রাজেডি" !

লেখাটির মর্ম ভেদ ক'রে "পুরবী সুরে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই করুণ গানটি" বার বার আমাদের মর্মবেধ করচে—

"হাহা মশাই আমরা সবাই পড়েছি এক ভাবনায়,
ভেবে দেখ্‌লাম আমাদের আর বেঁচে কোনই লাভ নাই !"

কেননা শ্রীদিলীপকুমার গবেষণা করেচেন বিজ্ঞান সম্বন্ধ—এর চেয়ে বিজ্ঞানের অতি বড়ো ট্রাজেডি আর কী হতে পারে ?

দিলীপকুমারের আঠারো পৃষ্ঠার বক্তব্য আঠারো কথায় দাঁড়ায় এই,

> "মানুষকে মুক্তি দেওয়া বিজ্ঞানের কাজ নয়। সে কাজ কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ অরবিন্দ প্রমুখ মহামানবদের।"

উপরে যে কয়জন মহাপুরুষের নাম করা হোলো তাঁরা সকলেই ধার্মিক এইজন্যে যে এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই এক একটি ধর্ম মোচন করে মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। সেই ব্যবস্থার ফলে বহু বহু লোক যে সদ্য সদ্য মুক্তি লাভ করেছিল ইতিহাসে তার নজির আছে।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এইখানে বিরোধ। মানুষকে মুক্তি দেওয়া তার কাজ নয়। মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেয়ে বড়ো কথা মানুষকে সম্পূর্ণ কবা; বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে মানুষকে সম্পূর্ণ করা।

কিন্তু যুগ যুগান্ত ধ'রে মহাপুরুষেরা মানুষকে ধর্মপ্রাণ করার যে মহৎ চেষ্টা করেচেন তা নিষ্ফল হবার নয়। ধর্ম-সংস্কার আমাদের মজ্জাগত। আমরা মানুষকে সম্পূর্ণ করতে চাইনে, সটান্ মুক্তি দিতে চাই।

এই সংস্কারবশে বিংশ শতাব্দীর মানুষও বিজ্ঞানকে "নূতন ধর্ম" রূপেই গ্রহণ করেছিল এই ভাবে যে এর সাহায্যে অনেক মানুষের অত্যন্ত সহজে সদ্যমুক্তি ঘটবে। সে-যুগে মানুষ ধর্মের দ্বারা নরহত্যা করতো কিম্বা নরহত্যার দ্বারা ধর্ম করতো, এ যুগে বিজ্ঞানের দ্বারাই সেই কাজ সে সম্পন্ন করতে চাইল। ধর্মের মার বড়ো মার! ফলে সেযুগের ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রের ওপরে টেক্কা মেরে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ধর্মযুদ্ধ ঘটে গেল সেদিন—উনিশ শো চোদ্দয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ তো মানুষকে ধার্মিক করা নয়, মানুষকে সম্পূর্ণ করা। কি ক'রে সম্পূর্ণ হওয়া যায় যদি জানে তাহলেই মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে। পাওয়ার একমাত্র বাধা হচ্ছে না জানা, এই কারণেই Knowledge is power। জ্ঞান যতক্ষণ কয়েকজনের অধিকার্য ততক্ষণ তা জ্ঞান; কিন্তু যখন তা

সকলের অধিকারে—সবার সেবায় লাগার যোগ্যতা লাভ করেচে তখন তার পরিণতি ঘটেচে বিজ্ঞানে। যেমন জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ভালো—এই জ্ঞান বরাবরই মুষ্টিমেয় লোকের ছিল; কিন্তু যেদিন এই জ্ঞান কেবল ব্যাপক নয়, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য হোলো সেদিনই এর বিজ্ঞান রচিত হোলো।

মানুষকে উদ্ধার করার বাসনা সকলেরই হয়। মহাপুরুষ-দেরও হয়। কিন্তু ভাগবত শক্তির মহাজন যাঁরা, তাঁদের গলদ এইখানে যে তাঁরা আধ-ডজন মানুষকে উদ্ধার (?) ক'রেই ভাবেন যে সমস্ত মানুষের উদ্ধার করলেন! তাঁরা বলেন, মুক্তি দিলেই হোলো না, তার অধিকারী-অনধিকারী আছে। তাঁদের ভাগবত-শক্তির সাধনাও ঐ ধারায়—পৃথিবীর মুষ্টিমেয় লোকের জন্য—যারা ভক্ত, যারা অধিকারী। তাঁদের সম্মুখে যেতে এইজন্যই বাধে যে তাঁদের সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নেই—আছে কয়েকটি মস্ত অ-মানুষ বা অতি-মানুষ।

যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির বা অর্থশক্তির মহাজন তাঁদেরো ঐ পন্থা। তাঁরাও বলেন, অর্থ বা ক্ষমতার অধিকার সব মানুষের হতেই পারে না,—তা থাক্‌বে ঐ দুয়েক-ডজনের হাতে। কেননা ক্ষমতা ও অর্থ যদি সকলের হাতে চারিয়ে যায় তাহলে ক্ষমতার কোনো অর্থ থাকে না এবং অর্থের ক্ষমতাও লোপ পায়।

কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য, বিজ্ঞানের সম্মুখে রয়েচে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ—সর্বদেশের ও

সর্বকালের। বিজ্ঞান যে-তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে তার ফলভোগী পৃথিবীর আপামর সাধারণ। তারা ভক্ত হোক্ বা না হোক্, বিশ্বাসী হোলো-বা-নাই হোলো। বিজ্ঞান মুক্ত-হাতে দেয়, কিছুই মুঠোর মধ্যে রাখে না—তার ষোলো আনা অধিকারী সবাই। এডিসন যে মুহূর্তে বৈদ্যুতিক আলোকে আবিষ্কার করলেন সেই সময়েই সেই আলো পৃথিবীর সকলের বরাতে এল। জগদীশচন্দ্র যে মৃতসঞ্জিবনী লাভ করেচেন সে-মৃত্যুজয় তাঁর একার নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের। বিজ্ঞানের চিন্তা নির্বিশেষ মানুষকে নিয়ে—এইখানেই তার সার্থকতার বীজ।

দিলীপকুমার হয়ত বল্‌বেন, এডিসনের ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর সুবিধা এখনো মুষ্টিমেয়ের অধিকারে, এখনো সকলের ঘরে এই আলো জ্বলেনি। জ্বলেনি যে তার কারণ সমাজের অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। পদ্ম ফুট্‌লে তার সুরভি তার মধু উপরের মহাজনেরাই বেঁটে নেন, মধু-র ভাগ যাদের মধুর ভাগ্য তাঁদের। যারা নিচে পাঁকের মধ্যে জীবন কাটিয়ে যায় তার ছিটে ফোঁটাও তাদের ভোগে আসে না।

তবু একথা সত্য, বিজ্ঞান যা-কিছু আবিষ্কার করেচে বা করবে, একদিন না একদিন সমস্ত মানুষের অধিকারে তা আস্‌বেই—কেননা এই আসার পথে অধিকার-ভেদের কোনো রহস্যময় বাধা এখানে নেই। আর, এইখানেই আশা। বিদ্যুতের আলোও সকলের ঘরে জ্বলবে, অক্ষয় যৌবনও সকলের

হবে, ইচ্ছামৃত্যুও হবে সবার। তার সূচনাও দেখা গেছে ইতিমধ্যেই—পৃথিবীর মধ্যে যে দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজ-ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়েচে সেই দেশে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যাতে রাশিয়ায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে রাশিয়ায় সার্বজনিক রাষ্ট্রে তার ব্যবস্থা হয়েচে। পুষ্পক রথ কেবলমাত্র কুবেরের জন্যই ছিল কিন্তু বিজ্ঞানের বাষ্প-রথ যখন চলল তখন সমস্ত মানুষকে নিয়েই চল্‌ল।

মানুষকে মুক্তি দেওয়া সহজ, যে-কোনো মহাপুরুষই তা দিতে পারেন। তত্ত্বমসি—এই তত্ত্ব মসীর দ্বারা বা অসির দ্বারা বসিয়ে দেয়ার যা অপেক্ষা! আমি মুক্ত—সোহং—এই বোধ মাথায় গজালেই হোলো কিম্বা গজালের মত হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দিলেই হয়। এ কাজ মহাপুরুষেই পারেন, কেননা তাঁদের এ-বোধ অতি সহজেই গজায়—যখন মহাপুরুষেও পারেন না তখন পারে গাঁজায়। আর সত্যি বলতে, গাঁজাতেও যেমন মজা, মজাতেও তেমনি মহাপুরুষ!

কিন্তু মানুষকে সুন্দর করাই কঠিন। দেহে মনে জীবনে নিখুঁত সুন্দর—মহাপুরুষের তা অসাধ্য। কখনো কদাচিৎ এক-আধ জন মানুষ দৈবাৎ এই সম্পূর্ণতা পেয়েচে। এতদিন বিধাতার খেয়ালের ওপর তা নির্ভর করতো, বিধাতার অনিচ্ছুক হাত থেকে সেই দায়িত্ব বিজ্ঞান নিজের হাতে নিয়েচে এখন। এখন আর বিধাতার পরোয়া না, মহামানবদের

তো নয়ই—সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ হবে এই পরোয়ানা আজ বিজ্ঞানের।

সম্পূর্ণতার গোড়ায় দুটো কথা। এক সম্পূর্ণ হওয়া, আরেক চরিতার্থ হওয়া; সম্পূর্ণ হওয়া মানে Complete হওয়া আর চরিতার্থ হওয়ার অর্থ Fulfilled হওয়া। সম্পূর্ণ হতে হলে তার গোড়ায় মানুষকে হতে হবে দেহে সুন্দর, মনে সরস, মস্তিষ্কে বিচারক্ষম; আর তা হতে পারলেই, তারপর থেকে তার সর্বতোপ্রকাশের পথ সহজ, অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। অখণ্ড সুষমায় লীলায়িত তার জীবন—তার জীবলীলা।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সুন্দর অবয়ব, বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামের দ্বারা দৈহিক-সামর্থ্য দেওয়া সম্ভব। আজই যদি দেহ-বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' একটিও দুর্বল কুশ্রী মানুষ থাকবে না, কেবলমাত্র সুন্দর সমর্থ নরনারীর বিচরণক্ষেত্র হবে এই বসুন্ধরা। বিজ্ঞানের সাহায্যে মাত্র তিন-পুরুষে মানুষের এই সৌন্দর্য-বিধান সম্ভব যা তিনশো মহাপুরুষের কম্মো নয়।

মস্তিষ্ককে বিচার-বিশ্লেষণে শিক্ষিত ও সক্ষম ক'রে তোলার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আছে; বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির সেই সুযোগ প্রত্যেককেই দেওয়া যেতে পারে। মানুষের মনস্তত্ত্বও আজ বিজ্ঞানের নখদর্পণে—মনোবিকলনের দ্বারা মনের সব

রকম বিকার ও বিচ্যুতি আজ দূর করা যায়। মানুষের চিত্ত আর অবচিত্ত-লোকেও বিজ্ঞানের সন্ধানী আলো প'ড়েচে—মানুষের ইচ্ছাশক্তির মূলে ও সৃজন-প্রতিভার উৎসমুখে যে পরম রহস্য নিহিত, তাও অচিরে নিরাবৃত ও নির্বারিত হবে, তাতেও কোনো ভুল নেই।

মানুষের মনকে সরস করবার, বিকশিত করবার ভার নিয়েচে সাহিত্য। সব কালের রস, সবকিছুর বোধ সঙ্গে নিয়ে সব দেশের মানুষের সহিত সে সচল। বিজ্ঞানের সঙ্গে তার আত্মীয়তা এইখানে যে সাহিত্যও সমস্ত মানুষের জন্য। মানুষকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা যেমন বিজ্ঞানের, তাকে চরিতার্থ হবার প্রেরণা দেওয়াও তেমনি সাহিত্যের। মানুষের সহিত মানুষের মিলনের রহস্যের মধ্যেই মানুষের চরিতার্থতার চাবি। সাহিত্য এই মিলনের পথকে মুক্ত করচে, প্রশস্ত করচে, বিচিত্র করচে—মিলনের প্রশস্তি-গানেই তো সাহিত্য। অবশ্য এই-চরিতার্থতার পথে বিজ্ঞানের সাহায্য অনেকখানি—তবু এই গর্ব সাহিত্যিকের যে মানুষের সম্পূর্ণতা সাধনের কাজে সেও বৈজ্ঞানিকের সহযোগী। সমকক্ষই।

বিজ্ঞানের কবল থেকে ভগবানও-যে নিষ্কৃতি পাবেন এ কথা আমি মনে করিনে। শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত সব মহাপুরুষই মানুষের সহিত ভগবানের যোগসাধনের প্রয়াস পেয়েচেন। দিলীপকুমারের মতে, "ভারত চিরদিনই ভগবানকে

প্রিয়তম হতে প্রিয়ই মনে ক'রে এসেচে, চিরদিনই অর্জুনের ভাষায় বলতে চেয়েছে ঃ—

"পিতেবপুত্রস্য সখ্যেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ !"

কিন্তু হলে কী হবে, সোঢ়ুম্-দেবের হৃদয়ে আমাদের জন্য চিরদিনই No-Room ! এত কান্নাকাটি করেও ভগবানের দিক থেকে কোনোদিনই কোনো response পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে ভগবানের কোনো responsibility বা respons-ability আছে এবকম লক্ষণও এপর্যন্ত তিনি দেখান নি। পৃথিবী দূরে যাক্, ভারতকেও-যে তিনি কোনোদিন প্রিয়তম মনে করেচেন এমন পরিচয় মেলে না, বরং বারম্বার প্রহারের দ্বারা কবিত্বগ্রস্ত অর্জুনকে ভ্যাবাচ্যাকাগ্রস্ত ধনঞ্জয়ে পরিণত করবারই তাঁর প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে।

কিন্তু অতিভক্তের অন্ধ ভক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারলেও বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর এড়ান্ নেই। বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে ভগবান যেদিন আবিষ্কৃত হবেন সেইদিনই এই গ্রহে ভগবানের সত্যিকারের মুক্তি ঘটবে। ভাগবত-শক্তি ব'লে সত্যই যদি কোনো শক্তি থেকে থাকে একদিন-না-একদিন তাকে বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণে পড়তেই হবে। এবং বৈজ্ঞানিকেরই পর্যবেক্ষণে,—কোনো মহাপুরুষের ভাবদর্শনে নয় ! তারপরে বৈদ্যুতিক শক্তিকে মানুষ যেমন নিজের কাজে লাগিয়েচে, ভাগবতশক্তিকেও সেইরকম সে মানুষের সেবায়

লাগাবে—সেই-শক্তিকে লক্ষ লক্ষ ভাগ করে'। বৈদ্যুতিক শক্তির মত সকলের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারায়। কিন্তু সেটা সম্ভব ভগবানের দরজায় উপোষ মেনে নয়, ভগবানকেই পোষ মানিয়ে, কব্জা করে'। এক কালে মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা সে-চেষ্টা যে হয়নি তা না, কিন্তু দেখা গেল তন্ত্রমন্ত্রণায় হবার নয়। তার ফলে ব্যক্তিক লাভ যদি কারো কিছু হয়েও থাকে, সে-সিদ্ধি সার্বজনিক হয়নি। আর, সবার যদি না হোলো তো কার হোলো? 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' ভগবানকে 'নাই' দেওয়া যায়, আদর করে মাথায় পরে ঠাঁই দেয়াও যায়—কিন্তু সর্বসাধারণের বাজারে এনে—বাজার-দরে পাবার পর। তখন হয়ত ভগবানকেই শ্রীঅর্জুনের ভাষায় বলতে হবে—

> হে মানুষ, "পিতা যেমন পুত্রকে দেখে, সখা যেমন সখাকে দেখে, প্রিয় যেমন প্রিয়াকে দেখে, তুমিও যেন আমাকে সেই চোখে দেখো।"

কে জানে, সেই শুভদৃষ্টির প্রতীক্ষায়, মহাপুরুষদের আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে ভগবান এখন বৈজ্ঞানিকেরই মুখ চেয়ে রয়েছেন কিনা!

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর বই

—সাম্যবাদী আধুনিক নাটক—

যখন তারা কথা বলবে—১৷০

—আন্‌কোরা গল্প-নাটক-প্রবন্ধ-কবিতার ওম্‌নিবাস্—

আমার লেখা—৪৷৷০

—হাসির গল্পের সংকলন—

পাত্র-পাত্রী সংবাদ—৪৲

বড়োদের হাসিখুসি—৩৲

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ—২৷৷০

—যে-বই হারাবার মতো মোটেই নয়—

আপনি কী হারাইতেছেন জানেন না—৩৲

—আদিরসের অনাদি রহস্যের সঙ্গে মিশিয়ে অফুরন্ত হাস্যরসের—

প্রেমের বিচিত্র গতি—৩৲

প্রেমের প্রথম ভাগ—২৷৷০

প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ—২৷৷০

মেয়েদের মন—২৷৷০

মেয়েধরা ফাঁদ—২৷৷০

—ছোট বড়ো সকলের বিশুদ্ধ হাসির গল্প—

দেবতার জন্ম—৩৲

শিবরামের সেরা গল্প ৪৲

বাড়ি থেকে পালিয়ে—২৲

আত্মীয়তা বজায় রাখা সহজ নয়—১৷০

ভূত ও অদ্ভুত—১৷৷০

বন্ধুচেনা বিষম দায়—১৷৷০

রসময়ের রসিকতা—১৷৷০

লক্রি আউর লক্কর—১৷৷০

আমার ভালুক শিকার—১৷৷০

শিব্রাম্ চকর্‌বতির মতো কথা বলার বিপদ—১৷০

সব বইই ক্যালকাটা বুক ক্লাবে পাবেন

কিছুদিন আগে শিবরাম চক্রবর্তী একখানি বই প্রকাশ করেছিলেন, যার নাম 'শিব্রাম চকরবর্তির মত কথা বলার বিপদ।' এরকম বিপদ সত্যিই কিছু ঘটতে পারে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বিপজ্জনক কথা শিবরাম বাবু নিজে অনেক বলেছেন এবং বলছেন। যে সময়ে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' প্রথম প্রকাশিত হয়, সে সময়ে এই ধরণের সব সত্যি কথা এত স্পষ্ট করে বলার মধ্যে নিশ্চয়ই বিপদ ছিল। বর্তমান সুলভ সংস্করণ সেই সত্য কথনের সৎসাহসকেই নিঃসন্দেহে মর্যাদা দেবে। সেই সত্যকথনের সার মর্ম হল—'আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল মার্কসের গীতা বড়ো, কেন না এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে।' এই কথা বলাকেই যাঁরা শিব্রাম চকরবর্তির মত কথা বলার বিপদ বলে আজও মনে করছেন 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' ঠিক তাঁদের জন্যই নূতনভাবে প্রকাশিত হল।